তবে রাজা দসাননে মুরে জিজ্ঞাসিল।
নেঙ্গে অগ্নি তুর মৃত্তু কি হেতু হইল॥
তবে আমি তাব পাসে কহিল সর্ত্যব।
সাগর তরিতে মুরে নাগে দিল বর॥
আমারে জিনিয়া জাও যথা লক্ষেশ্বব।
নেঙ্গে অগ্নি দিলে তোর নাসৌক কলেবব॥
তবে রাজা স্থুত আনি কহিল সর্ত্যর।
বস্ত্র আনি নেঙ্গে তার বান্ধয় সমুল॥
তবে বস্ত্র দিয়া নেঙ্গ বান্ধিল সকল।
নেঙ্গে অগ্নি দিয়া রাজা হাসে খল খল॥
তবে আমি মায়া কবি কান্দিলু বিস্তব।
আব না দেখিল আমি বাম গদাধব॥
আর না দেখিল আমি জত বানর্গন।
তাহা সুনি দসাননে হাসে ঘন ঘন॥
দেখিলাম বর্হ্নি* জদি বড় হৈল তাপ।
সভাতে দহিল আগে বাজার দাড়িচাপ॥
তার পবে অগ্নি দিল ইন্দ্রজিতেব পুবি।
সবেমাত্র রৈক্ষ্যা কৈল কুম্ভকর্ণেব বাড়ি॥
আব সব নাস্র কবি জত ইতি স্থান।
তবে চলি গেল আমি সিতা বিন্তমান॥
অগ্নিতাপে প্রানি দহে সুন দেবি আই।
সিতা কহে সুন কপি কহি তুব ঠাই॥
মুখেব আমৃত দিয়া তাকে সাম্য কব।
এত সুনি নেঙ্গ দিল বদন ভিতর॥
প্রান রৈক্ষ্যা মুখ পুব। সুন ধনঞ্জয়ে।
আসিয়া কহিল বার্ত্তা রামের পাসয়ে॥
সাগব বান্দিয়া রাম্র গেল লঙ্কাপুরি।
রাবনের বংস মারি সিতাকে উদ্ধারি॥
তবে বিপ্র ধনঞ্জয়ে তাকে প্রনমিল।
সমন্দ বিসয়ে জেবা তাহাকে কহিল॥

এতেক সুনিয়া পার্থ কবিল প্রনাম।
আসির্ব্বাদ কৈল পুবৈক মনসকাম॥

---

* বহ্নি॥

পবন ঔরসে জন্ম তুমি জেষ্ট ভাই ।
তাহান অদিক তোমি আমার গুসাঞি ॥
অর্জ্জোনে কহেন আমি এই বর চাই ।
তোমা নিজরোপ দেখি নবির জুড়াই ॥
হাসিয়া কহিল আজ্ঞা বির হনুমান ।
সকল বাহিনি তবে আইল বিগ্রমান ॥
জথাযুক্ত সম্বাসা কবিল সর্ব্বগণ ।
পুনরপি কহে পার্থে করুনা বচন ॥
তবে হনুমানে তাব নিজমূর্ত্তি ধবে ।
দেখিয়া মুদিল আক্ষি ধনঞ্জয় বিবে ॥
পার্থে বোলে নিবেদন স্তনহ গোসাঞি ।
তোমার আদেস পাইলে বাহিনি চালাই ॥
হাসিয়া কহিল আজ্ঞা বির মহাসয়ে ।
লুমাঞ্চিতকলেবর হৈল ধনঞ্জয় ॥
আজ্ঞা কর মহাসহে লঙ্কা জাইবার ।
তথা হনে ধনরত্ন বস্ত্র আনিবার ॥
হনুমানে কহে বির পাসর আপনা ।
সাগর তরিব হেন আছে কুন জনা ॥
হাসিয়া কহিল পার্থ করি অঙ্গিকার ।
আজ্ঞা কবি সঙ্গে চল সমুদ্র কিনার ॥
হাসিতে হাসিতে জায়ে পবননন্দন ।
মহুদধি সাগরেত জায়ে ততক্ষন ॥
দেখিল অপার সিন্ধো নাই দিবারাত্রি ।
ধুম্রময়ে দেখি সব্ব নাই দেখি স্তিতি ॥
দেখিয়া সকল সর্ব্বে অন্তরে তরাস ।
মুখে ধুলা উড়ে সব জিবন নৈরাস ॥
চারি দিগে হনুমানে করে নিরক্ষন ।
দেখি সর্ব্ব অধুমখি সুসিল* বদন ॥

কিঞ্চিত হাসিয়া কহে পবননন্দন ।
লঙ্কাতে জাইতে পার্থ না কর জতন ॥

পার্থে বোলে মহাসয় জবে আজ্ঞা পাই ।
তোহ্মাব সাক্ষ্যাতে সব বাহিনি আনাই ॥
হাসিয়া কহিল আজ্ঞা বির হনুমান ।
কুসল বাহিনি আনি কৈল বিগ্যমান ॥
জথাজুক্ত সম্বাসা কবিল সেনাগণ ।
পুনরপি বোলে পার্থ পাণ্ডুর নন্দন ॥

আজ্ঞা কর মহাসিএ লঙ্কা জাইবার ।
তথা হতে ধন রত্ন জিনি আনিবার ॥
হনুমন্তে বোলে বির পাসর আপনা ।
সাগর লঙ্ঘিবর হেন আছে কোন জনা ॥
হাসিয়া বোলেন্ত পার্থ করি অহঙ্কার ।
চল সৈন্য সঙ্গে জাই সাগর তরিবার ॥
হাসিতে হাসিতে চলে পবননন্দন ।
মোহদধিতিরে গিয়া বোলে ততৈক্ষন ॥

দেখী সৈন্য অধমুখ সুখাইল বদন ।
সাগরতরঙ্গ জদি দেখীল তখন ॥
অর্জ্জুনক বো[লে]ল তবে পবনতনয় ।
লঙ্কাপুরি জিনিতে জিবন সংসয় ॥

* শুষ্ক ।

হাসিয়া কহিল পার্থ না কর বিস্ময় ।
বান্ধিব সাগর আমি দিয়া স্বরচয় ॥
কিন্তো এক নিবেদন করি তুমা পাস ।
লঙ্কা জেই দিগে তোমি কবি দেও আস ॥
আপনে জাইবা তোমি স্বরবন্দ দিয়া ।
তোমারে স্বযায়ে* বস্ত্র আনিবাম গিয়া ॥
ক্রোধ করি হনুমানে কহে আরবার ।
তব + তোমি বাক্যবল সিন্দো তরিবার ॥
অর্জ্যোনে কহেন আগে দেব জগন্নাথ ।
তাহান প্রসাদে আর তোমা আসির্ব্বাদ ॥
আজ্ঞা কর স্বরে বান্দি রামবন্দ সম ।
দেখ দেখ মহাসয়ে আমার বিক্রম ॥
পুর্ব্বকথা স্বুনিয়া মনেত চক্ষি বড়ি ।
স্বরে সিন্দো না বান্দিল রাম নরহরি ॥
বানর সবেরে ভর্ক দিল অকারন ।
স্বরে সিন্দো না বান্দিল রাম নারায়ন ॥
ই বোলিয়া অর্জ্যোনে ধনুতে দিল গুন ।
অস্ত্র সব শির্ক্ষ্যা তার সংগ্রাম নিপুন ॥
কৃষ্ণ বিষ্ণু জনার্দ্দন স্বরে ধনঞ্জএ ।
বর দেও লঙ্কা গিয়া করিয়ে বিজয় ॥
খাণ্ডব দহিলা হরি বনে অগ্নি দিয়া ।
তোমার প্রসাদে আছি ইন্দ্রেরে জিনিয়া ॥
এত বোলি ধনঞ্জয়ে এড়ে স্বড চাপ ।
গগন সমান উঠে সাগরের ঝাপ ॥
মহা কুলাহল দেখি কবহে সাগর ।
পাসে সিন্দো বন্দ করে দস প্রহর ॥
নরনারায়ন সে জে পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
নিমেসে বান্দিল সিন্দো দস প্রহর ॥
দুই দিগে বান্দিয়াছে স্রোতে নাই লড়ে

হাসিযা বোলেন্ত পার্থ নাহিক সংসয ।
সবে ব[া]ন্দি পার হইব নাহি কোন ভয় ॥
আপনে জাইবা সঙ্গে বনপথে দিয়া ।
আসিব তোহ্মার বলে ধন বস্ত্র লইয়া ॥
ক্রোদ্ধ [হই] হনুমানে বোলে আরবার ।
কোন দপে বোল সাগর হইতে পার ॥
অর্জ্জুনে বোলেন্ত আছে কৃষ্ণ ভগবান ।
তাহান প্রসাদে করি তোহ্মা বিগুমান ॥
আজ্ঞা কর সেতু বান্দম রামচন্দ্র সম ।
দেখ দেখ মহাসয়ে আহ্মার বিক্রম ॥
কি কারনে ভঙ্গ পাইল রাম ভগবন্ত ।
তুহ্মি সব সঙ্গে ছিলা বিক্রমে যে হন্ত ॥
কৃষ্ণ স্বরে স্মরিয়া গাণ্ডিবে জোড়ে স্বর ।
লঙ্কা পুরি জাইবার দেয় জয় বর ॥
খাণ্ডব দাহন জেই বান সান্দি ছিল ।
এড়িল জে মহাসর দক্ষিন পাসে গেল ॥
তখন পাতাল দেস ছাড়িল সাগর ।
দেখে দস জোজন জুড়িল দির্ঘ সর ॥
এড়িলেক মহাসর মহদধি কাপে ।
গগন গর্যনে জেন মহামেঘ চাপে ॥
পাসে দস জোজন কৈলা সরে আবরিয়া ।
দুই দিগে পথ কৈল সর পর দিয়া ॥
বজ্রসম বান্ধিলেক দুই দিগের সব ।

---

* সহায়ে ।

দুই দিগে মহা ঢেউ [উ]ঠিয়া আছাড়ে ॥
না পারে নাড়িতে বন্ধ হাসে ধনঞ্জয়।
অনেক বিস্ময়ে তবে পবনতনয়ে ॥
অর্জ্যোনে কহেন তবে সুন হনুমান।
মুব এক নিবেদন কব অবধান ॥
অনুগ্রহ কব জদি কর নিবেদন।
সর্ব্ব সমে আগে তোমি করহ গমন ॥

নিশ্চয়ে বন্দিল দস জোজন সাগর ॥
নবনারায়ন রূপ পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ডণ্ডেকে বান্দিলা বির গহিন সাগর ॥
সম্পূর্ণ বন্ধন কৈল স্রোত নাহি চলে।
দুই দিগে মহা ঢেউ সমুদ্র উথলে ॥
না পারে নাড়িতে সব হাসে ধনঞ্জয়।
ক্রোধে মোহশ্চিত কপি পবনতনয় ॥
অর্জ্জুনে বোলেন্ত সুন ভাই হনুমান।
আপনে অর্থবে (?) কিছু কব অবধান ॥
আপনে চলহ আগে কব অনুগ্রহ।
সর্ব্ব সৈন্য সমুদিতে লঙ্কাতে চলহ ॥

শুনে হনুমান বির ক্রোধ গুরুত্তর।
পার্থেরে গর্জ্জিয়া কহে বার্ক্য বহুত্তর ॥
কেবল বালক তোমি নাই দেখ বন।
আমার সাক্ষ্যাতে কহ এতেক বচন ॥
কৃষ্ণের পরম বন্দো জানি তুয় বির।
তে কারনে মুব পাসে কহ বিপরিত ॥
আর জন হৈত জদি নহিত জিবন।
আব কেহ নাই কহে এমত বচন ॥
সুমেরু সমান সে জে গন্ধমাধন।
সাথে করি নিল আমি লঙ্কার ভুবন ॥
তাহা হনে ঔসদ দিয়া লক্ষন প্রানি রাখি।
ইয়াকে জে নাই জান না জানিয়া সাক্ষি ॥
কৃষ্ণবরে সিন্দো বান্দিআছ সিন্দুবর।
সর্ব্বসমে মুবে দেও তাহার উপর ॥
তর্জিয়া গর্জ্জিয়া তারে কহে হনুমান।
মহাকায় করে বিরে পর্ব্বত সমান ॥
লুম গোটা করে তার সাল তরু সম।
দ্বিগুন হাসিয়া করে অতুল বিক্রম ॥
দুই চক্ষু হতে অগ্নি উঠে ঘন ঘন।
গগনে বিজুলি জেন ছুটকে সগন ॥

তাহা সুনি হনুমন্তে ক্রোধে গুরুতর।
পার্থেরে গর্জ্জিয়া বোলে বাক্য খরতর ॥
স্বরূপ ছাওয়াল তুহ্মি না দেখীছ বন।
আহ্মার সাক্ষ্যাতে বোল অযুক্ত বচন ॥
কৃষ্ণের পরম বন্দু সেই সেঁ কারন।
আর জন হইত জদি লইতাম জিবন ॥

সমেরু পর্ব্বত সমে গন্ধ জে মাদন।
উপাড়িয়া নিয়া কৈল লক্ষন জিবন ॥
আপনা বিক্রম হতে এড়িলুম সাগর।
লঙ্কাপুরি পুড়িয়া সকল নিসাচর ॥
সবে সব দিয়া তুহ্মি বান্দিলা সাগর।
আহ্মি পার হইতে বোল তাতে করি ভর ॥
গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে ক্রো[]ধ বাঢ়ে হনুমান।
মহাকায় হইল জে সুমেরু সমান ॥
পাসে দুইর কপিরাজা ত্রিসস জোজন।
দির্ঘ [illegible] জোজন হইল সরির সোভন।
[illegible] বৃক্ষ সম লোম সরির [illegible]।
[illegible] ভাস্কর জিনি সরির সোভন।

গুরুতর।

হনুমান তেজ দেখি কাঁপে সন্যগন ।
হাসিয়া কহিল পার্থ বিনতি বচন ॥
ক্রোধ ছাড় মহাবির সাক্ষ অদিরাজ ।
লঙ্কাপুরি প্রবেসিয়া সিদ্ধি কর কাজ ॥
অর্জ্যোনমুখেত সুনি বিনতি বচন ।
ক্রোধ করি উঠে তবে পবননন্দন ॥
লম্প দিয়া উঠে বির সরের উপর ।
পার্থরে না নড়ে জেন সুমেরু সিখর ॥
পৃথিবি চলিতে পারি মুর বাহুবলে ।
না জানিল তার তর্ত্ত ভাবে মহাবলে ॥
স্মরের উপরে হাটে হনুমান বির ।
দেখিয়া লুমাঞ্চ তার সকল সরির ॥
মধ্যসাগরে জায়ে বির হনুমান ।
সহিতে আছয়ে ভার দেখে বিদ্যমান ॥
মনে মনে হনুমানে চিন্তিল তখনে ।
মুর ভার সহিতে না পারে ত্রিভুবনে ॥
স্মরমুলে সক্তি আছে সহে মুর ভার ।
না জানি ইহাত আছে কেমত প্রকার ॥
এমত ভাবিয়া বিরে মধ্যখানে গিয়া ।
জলেত পড়িল বির তাপে ঝাম্প দিয়া ॥
বিশ্বাম্বর রূপ ধরি স্মরমুলে হরি ।
এক এক স্মরে আছে এক কৃষ্ণ ধরি ॥
জত দুর স্মরবন্দ সাগর প্রমান ।
তথ দুর ধরিআছে কৃষ্ণ ভগবান ॥
চতুর্ভুজ মুর্ত্তি ধরি স্মগ জে অনন্ত ।
স্তোতি করে তথা থাকি বির হনুমন্ত ॥
তোমার অপার মায়া জানে কুন জন ।
জারে তোমি কৃপা হয় সে পুনি সুজন ॥
স্তোতি করি তথা হনে উঠিল মর্ত্যের ।
সদয়ে হইয়া গেল পার্থের গোচর ॥
ধৈন্য ধৈন্য বোলি তারে দিল আলিঙ্গন ।
সাত্যকি সাদনা কর ইন্দ্রের নন্দন ॥

হনুমানমুর্ত্তি দেখি কাপে সৈন্যগন ।
হাসিয়া বোলেন পার্থ বিনয়বচন ॥
ক্রোধ এড় মহাবির চাহিতে ধর্ম্মরাজ ।
লঙ্কাপুরি পার কর সিদ্ধি কর কাজ ॥
ক্রোধে লম্প দিয়া পড়ে সরের উপর ।
পথক্রমে চলি যেন সুমেরুশিখর ॥
সরপথে চলি জাএ হনুমন্ত বির ।
দেখী লোমাঞ্চিত হইল বিরের সরির ॥
মৈদ্ধে সাগর গেল বির হনুমান ।
না ভাঙ্গে শরের বন্দ ভাবে অপমান ॥
মনে মনে হনুমান ভাবে ততৈক্ষন ।
মোর ভর সহিতে না পারে ত্রিভুবন ॥
মনিষ্যের সরবান্দে সহে মোর ভর ।
না বুঝি এহাতে আছে কেমত প্রকার ॥
স্থির করিবারে নারে মনেত ভাবিয়া ।
সাগরের জলমৈদ্ধে পড়ে ঝাপ দিয়া ॥
ডুব দিয়া চাহে সব বির হনুমন্ত ।
চতুর্ভুজ দেখীলেক মুর্ত্তি অনন্ত ॥
জত দুর সরবন্দ সাগর প্রমান ।
তত দুর যুড়িয়া রহিছে ভগবান ॥
বিস্বরূপ হইয়া প্রভু ধরিছেন বান ।
ইসিত হাসিয়া বোলে বির হনুমান ॥
উঠ উঠ মহাপ্রভু বোলে হনুমন্ত ।
তোহ্মার সকল মাঞা বিজয় অনন্ত ॥
তোহ্মার সেবক আহ্মি জানে ত্রিভুবন ।
মনিস্যের সঙ্গে লর্জ্জা দেয় কি কারন ॥
সর এড়ি মহাপ্রভু অন্তর হও এবে ।
অর্জ্জুনের দর্পচুর্ন্ন করিবম তবে ॥
হাসিয়া বোলেন প্রভু সুন হনুমান ।
আহ্মার সেবক তুহ্মি জগত বাখান ॥
ধরনি ধরিতে পার তোহ্মার সকতি ।
অর্জ্জুন আহ্মার দাস শুন মহামতি ॥

অনাদি নিধন হবি ভুবনেব সাব।
জাহাব স্মবনে হয়ে পাতকি নিস্তাব॥
তোমাব সকতি নাই ই কম্ম কবিতে।
কৃষ্ণেব এমত ক্রিপা না পাবি বোজিতে॥
করপুটে বোলে পার্থে তোমি মহাজন।
রামেব সেধক তুমি পবননন্দন॥
তোমি কব জাব পুজা আমি তান দাস।
ইয়লুকে পবলুকে তান পদে আষ॥
আমাবে সদায় তোমি হয়ত করুন।
এত বোলি তাব পদে ধবিল অর্জ্যোন॥
সদয়ে বিদয়ে হৈয়া দিল আলিঙ্গন।
চল পার্থ সন্ন সমে লঙ্কাব ভুবন॥
এত বোলি হনুমান চলে ততর্ক্ষন।
সংহতি চলিল পার্থ নবনাবায়ন॥
১৫৫০ সং পুথি, ৫—৭ পত্র।

লঙ্কাপুবি জাও তুহ্মি আহ্মার আদেস।
তোহ্মা হতে ধনঞ্জয় না হএ বিসেষ॥
বিষ্ণু প্রেনমিয়া বিব উঠিল সত্বর।
সদএ হইয়া গেল অর্জ্জুন গোচব॥
ধন্য ধন্য কবি বিবে বলিল বচন।
সার্থক অর্জ্জুন তুহ্মি ইন্দ্রের নন্দন॥
অনাথেব নাথ হবি ত্রিভুবনে সাব।
জাহাবে ভাবিলে হএ ভবিস্বত পাব॥
তোহ্মাব সকতি নাই কবিতে এহি কর্ম্ম।
কৃষ্ণেব প্রভাবে কব॰জানিলাম মর্ম্ম॥
সাগবেব জলে আহ্মি দিয়াছিল ডুব।
ধবি আছে ভগবানে হইয়া বিশ্বরূপ॥
জলমৈধ্যে ভগবান ধবি আছে সব।
তে কাবনে তোব বান্দে সহে মোব ভব॥
কবপুটে বোলে পার্থ স্থন মহাজন।
শ্রীবামসেবক তুহ্মি পবননন্দন॥
প্রভুব সেবক তুহ্মি আহ্মি তান দাস।
ইহলোকে পবলোকে আহ্মি তান দাস॥
আপনে স্বরূপ তুহ্মি হও সকরুন।
এ বোলিয়া পাএ তান ধবিল অর্জ্জুন॥
সকরুনে হনুমানে করিল অঙ্গিকাব।
সৈন্য সমে চলে পার্থ সহিতে আহ্মার॥
এ বোলিয়া হনুমানে চলে ততৈক্ষন।
সবান্ধবে গেল তবে লঙ্কাব ভুবন॥
২০২৪ সং পুথি, ১১২—১১৪ পত্র।

৬। শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ *

(ভীষ্মপর্ব্ব)

সঞ্জয় হইতে ঃ—

তাবে দেখি ক্রোধ হইলা কৃষ্ণ ভগবন্ত।
আজি ভিস্ম মাবিয়া কবিমু জুদ্ধ অন্ত॥
ধৃতবাষ্টেব পুত্র সব কবিমু সংহার।
জুধিষ্ঠিরেত সমর্পিমু জত বায্যভাব॥
এতেক বোলিয়া কৃষ্ণ দেব মহাবিব।

পরাগলীতে ঃ—

দেখহ সাত্যকী মুই চক্র লইলাম হাতে।
ভিস্ম দ্রোন কাটি পাড়িমু বথ হতে॥
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সব কবিমু সংহাব।
জুধিষ্টির নৃপতিক দিব রার্জ্জভার॥
এত কহি সাত্যকীক কৈল সম্বোধন।

---

* দীনেশ বাবু তাঁহার সঞ্জয়-ভারতের পুথিতে এই অংশটী পান নাই। তাই লিখিয়াছেন ঃ—
"শ্রীহরি যে স্থানে স্বপ্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া রোষক্ষিপ্ত গজেন্দ্রবৎ ভীষ্মকে বধ করিতে সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন—কবীন্দ্রের বর্ণনা সে স্থলে বড় সুন্দর, কিন্তু সঞ্জয়-ভারতে এই প্রসঙ্গ এবং অন্যান্য সুন্দর আখ্যানের একেবারে উদয় হয় নাই।" বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৩৭ পৃঃ (৪র্থ সং)।

হাতে বজ্র (চক্র ?) ধ্বসিলা মারিতে ভিস্মবির ॥
রথে হতে লামি জাএ চক্র করি হাতে।
ভিস্মকে মারিতে জায়ে দেব জগন্নাথে ॥
ক্রোধে পদভরে কাপে সর্ব্ব রনস্থলি।
মৃগেন্দ্র মারিতে জায়ে সিংহ জেন চলি ॥
দেখি ভিস্মে ছাড়িল হাতের ধনুবান।
জুড়হস্ত করি বহে হৈআ স্তবমান ॥
ভিস্মে বোলে মহাভাজ্ঞ হৈল আজি মব।
নিজ হস্তে কৃষ্ণ দেব মাথা কাট মব ॥
ইহলুকে জস পুন্য মুক্তি পরলুকে।
ত্রিভুবনে ক্ষ্যাতি ধর্ম্ম ঘোসিবেক মকে ॥
দেখিআ কৃষ্ণের কুপ অর্জ্জুনে তথন।
বথ হইতে লামি ধাইয়া পড়িল চরন ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৫৬ সং পুথি
(সঞ্জয়কৃত ভীষ্মপর্ব্ব) ২৯ পত্র।
(তাং ১২১৭।১০ ফাল্গুন।)

হস্তেত লইল চক্র দেব জনার্দ্দন ॥
সুর্জ্জের সমান তেজ সত বজ্রসম।
চারি পাসে খুর তেজ জেন কাল জম ॥
বথ হতে ফাল দিয়া চক্র লইয়া হাতে।
ভিস্মক মারিতে জাএ ত্রিজগতনাথে ॥
কৃষ্ণঅঙ্গে পিতবস্ত্র সোভিছে তথন।
বিদ্যুত সহিতে জেন আকাসে সোভন ॥
তা দেখিয়া সর্ব্বলোকে কহএ কথন।
কৌববের ক্ষয় আজি দেখীএ লৈক্ষন ॥
পদভরে কৃষ্ণের কাপএ বসুমতি।
গজেন্দ্র ধবিতে জেন জাএ মৃগপতি ॥
সম্ভ্রম না করে কৃষ্ণ হাতে ধনুসব।
নির্ভয় সরির ভিস্ম সংগ্রাম ভিতব ॥
জগতের নাথ আইসে মাবিবাবে মোক।
বথ হতে ফালাএ দেখউক সর্ব্ব লোক ॥
তুহ্মি মোবে মাবিলে তবিমু পবলোক।
ভুবন মৈদ্ধেত জান ক্ষ্যাতবন্ত মোক ॥
জুঝিবাব শ্রধা নাই কহিছম অথন।
তোহ্মাকে বুঝাইমু আহ্মি প্রতিজ্ঞাবচন ॥
এতেক কহিল জদি ভিস্ম মহাসএ।
রথ হতে নামে তবে বিব ধনঞ্জয় ॥
সেবকবৎসল কৃষ্ণ করুনাসাগব।
কৃপা কবি জাএ কৃষ্ণ কবিতে সমব ॥
বাধীবারে জষ্ণ কবে না পাবে রাখিতে।
ক্রোধে আকুল তনু অর্জুন সহিতে ॥
বাউ জেন অন্তকালে বহে উড়াইযা।
তেনমতে ধাবাএ কৃষ্ণ অর্জুন লইয়া ॥
এহিমতে দস পদ গেল জদি ভবি।
আগু হইয়া পাএ ধবি রাখে জত্ন কবি ॥
মুকুট কাঞ্চনমালা লাগএ ভুমিতে।
সম্বব সম্বর কোপ দেব জগন্নাথে ॥
প্রতিজ্ঞা করিছি আহ্মি তোহ্মার সাথাতে।
পুত্রের সবদ লাগে ভিস্মক মারিতে ॥
সর্ব্ব বিব মারিলে কৌবব হইব ক্ষয়।
তোহ্মার প্রসাদ হইব সংগ্রামেত জয় ॥
অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা সুনিয়া দামুদর।
ক্রোধ ছাড়ি পুনি উঠে রথের উপর ॥

ঢা, বি, ২০২৪ সং পুথি, ১৯৪-৯৫ পত্র।

৭। কর্ণ ও শল্য *

(কর্ণপর্ব্ব)

সঞ্জয়ে :—

কর্ণ্যে পুনি কটকের রঙ্গ বাড়াইতে।
একে একে সমাকে জে লাগিলা বলিতে॥
জে মরে অর্জ্জুন আজি দেখাইতে পারে।
কটক (শকট ?) ভরিয়া রত্ন ধন দিমু তারে॥
অর্জ্জুনকে আজি মরে পারে দেখাইতে।
লেঞ্জ কালা ধবল ঘুড়া বহে দির্ব্ব রথে॥
সবৎছ তরুনি ধেনু দিমু এক স[া]ত।
তাকে দিমু অর্জ্জুনকে দেখাইআ দেয় মতে॥
রথ হস্থি ঘটক সকট ভরি সুনা।
তারে দিমু অর্জুন দেখায়ে জেই জনা॥
মনি মুক্তা হার অলঙ্কার সতে সতে।
তারে দিমু অর্জুন দেখায় জে আমাতে॥
শ্যামল তরুনি গিত গায় সুললিত।
এ সকল কৈন্ঞা দিমু সুবর্ণ্যে ভুসিত॥
সাগরের তিরে দির্ব্ব দেখিতে উত্তম।
হেনমত গ্রাম দিমু ইন্দ্রপুরি সম॥
অর্জ্জুনকে আমারে দেখায়ে অবিলম্বে।
ঝাটে চল সর্ব্বলুক না সহে বিলম্বে॥
মনিমুক্তা অবরন দেম দির্ব্ব হার।
এই মত বাক্য পুনি বলে বার বার॥

* * * *

সুনিয়া ই সব সৈল নারে সহিবার।
বলিতে লাগিলা কিছু হৃদা বলিবার॥
কর্ণ্যে জত বলে সব না সহি পরানে।
[illegible]র্জুন মারিতে বিফল আসা কর্ণ্যে॥
ভালমন্দ তুমি কিছু নাহি বুঝ ভালে।
দুই সিংহ মারিতে চাএক হি অকালে॥
অসম্ভব কথা কহ সুনিতে অনুচিত।
জিব জে তাহার নহে এমত উচিত॥
গলাএ পাথর বান্ধি সাগরে সাতুরে।
গিরি হনে লম্পে পড়ে ভুমির উপরে॥
সেই মত বুজিলু তুমার অভিলাস।
মর বুলয় রাথ জিবনের আস॥

* * * *

পরাগলীতে :—

পাণ্ডববাহিনি কর্ন্নে সমুখে দেখিয়া।
অহঙ্কার করি কর্ন্নে বুলিল ডাকিয়া॥
জে মোরে দেখাইতে পারে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
এক সত গ্রাম দিমু পরম সোন্দর॥
পঞ্চ সত রথ দিমু হিরাএ মণ্ডিত।
দুই সত রথ দিমু কাঞ্চনে ভুসিত॥
জে মোহে দেখাইতে পারে অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
চারি সত ধেনু দিমু তাহারে নিশ্চএ॥
তিন সত কৈন্যা তানে দিমু জে নিশ্চএ।
দুই সত হস্তি দিমু মহা তেজমএ॥
রাঙ্গা কালা হস্তি দিমু কাঞ্চনে জড়িয়া।
জেই জনে অর্জ্জুনেরে দিব দেখাইয়া॥
তিন লৈক্ষ স্নেনা দিমু হিরাএ সহিত।
জেই জনে অর্জ্জুনেরে দেখাএ বিদিত॥
অর্জ্জুন সহিতে কৃষ্ণে করিয়া সংহার।
জত ধন পাই আঞ্চি সকল তাহার॥
সঞ্জয়ে বোলেন্ত সলো কুপিল তখন।
কর্ন্নক আক্ষেপি বোলে কুৎসিত বচন॥
জত ধন দেয় মূঢ় এক জৈজ্ঞ হএ।
অকারনে ধন কেহে দিবারে চুয়ায়॥
অথনে দেখিবা পার্থ থেনেক হও স্থির।
সিংহ জেন দেখিবা অর্জ্জুন মহাবির॥
কি কারনে ধন দিবা দেখিবা অর্জ্জুন।
বিপাক হইলা তোর স্তুতপুত্রে সুন॥
কৃষ্ণ সনে অর্জ্জুনেরে করিবা সংহার।
হেনমতে বুদ্ধি তোরে দিল কোন্ ছার॥
সিংহে জদি শ্রীকাল মারিতে পারে রনে।
তবে সে অর্জ্জুন বধ সুনহ অথনে॥
পালাইয়া পার্থ সনে জাও বারে বার।
কেমন পৈরস তাকে নিন্দ দুরাচার॥
মরিবার কালে হএ বুদ্ধি বিপরিত।
জানিলাম অর্জ্জুন হাতে মরিবা নিশ্চিত॥
বুদ্ধিমন্ত বন্ধু নাই কহিতে কথন।
বিপরিত বুদ্ধিদোসে হইবা নিধন॥

---

* দীনেশবাবু এই প্রসঙ্গটী সঞ্জয়ের নিজস্ব বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। ব, ভা, সা, ৬ষ্ঠ পৃঃ (৫ম সং)।

কুপ বাড়াইতে সৈর্স্য লাগে বলিবাব।
ফুটিলে অর্জ্জুনবান না বহিবা আর॥
দির্ব্ব ধনু লৈআ জদি সুর্ন্য কৈলা ক্ষয়।
তবে সে জানিবা তুমি বিব ধনঞ্জয়॥
মায়েব কুলেত জেন বসিআছে আনে।
চন্দ্র ধবিবাবে জেন চায় বামনে॥
হেন মতে কর্ণা তুমি বলহ দারুন।
মাবিবাবে চাহ তুমি কৃষ্ণ অর্জ্জুন॥
লেঙ্গুড় লাডএ জেন কালসপকায়।
ছাআল হৈয়া হবিন সিংহকে বুলায়॥
মৃগমাংস্য খাইআ জেন স্রীকালেব ৠল।
সিংহসনে জুদ্ধ চাহ হৈতে নিমূল॥
সুতপুত্র তুমি বল বাজপুত্র কেনে।
কুকুব হৈআ জুদ্ধ মল্ল হস্থি সনে॥
গাতে কাল সর্প কেনে লাড হাত দিআ।
সিংহকে আস্ফাল কব স্রীকাল হৈআ॥
সর্পে গড়ুবকে ধায় বৎস জে বৃসকে।
সেইমতে কর্ন্যে আস্ফালিলে অর্জ্জুনকে॥
চন্দ্র উদিতে জেন বাড়এ সাগব।
বিনা নাএ ভাস তুমি সুনবে বব্বব॥
বড় ব্যাঘ্র দেখি জেন গর্জ্জএ কুকুরে।
বিড়াল দেখিআ জেন আস্ফালে উন্দুবে॥
তেন হি তুমাব কথা বুজিলু মনয।
শ্রীকাল হইআ তাকে দেখিলে বনয়॥
ব্যাঘ্র কুকুবে যেন উন্দুব বিড়ালেত।
অর্জ্জুন তুমাব'তেন ভেদ এই মত॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব ৮৬৫ সং পুথি,
(সঞ্জয়কৃত কর্ণপর্ব্ব) ৪৭-৪৮ পত্র।
[১৫৫০ সং পুথিব ৫—৬ পত্রেও এই আখ্যানটি আছে।]

গলাএ পল্লভ বান্ধি জাও পার্থ স্থানে।
জদি ভাগ্য থাকে মুঢ় বাচিবা পরানে॥
মহাব্যাঘ্র পার্থ বিব তুমি মৃগছাও।
দৃষ্টিমাত্র অর্জ্জুন কম্পিত হইব গাও॥

দুর্জ্জোধনপুয্য তুহ্মি হিত চাও তাক।
মবিবা জে সুতপুত্র দৈবেব বিপাক॥
ধন কেহ্নে দিয়া মুঢ দেখিবা অর্জ্জুন।
বিভিসিকা কবি কেহ্নে দেখাও নিপুন॥
জদি বজ্র হাতে কবি আইসে পুরন্দব।
তবো না জিনিবা তুহ্মি পার্থ ধনুর্দ্ধব॥
মৃগ হইআ দেখাওসি ব্যাঘেবে ভাবকি।
ই ভাবকি ভাঙ্গিবেক অর্জ্জুন ধানুকি॥
হে[ন] মতে সল্যে তাবে বোলএ নিষ্ঠুর।
থব থব কাপে তবে কর্ন্ন মহাসুব॥
ধৃতবাষ্টে বোলে সৈল্যে বোলে বিপবিত।
ই সব বহস্য তবে না হএ উচিত॥
মহাবংসে জন্ম কর্ন্ন বুদ্ধি অনুমানে।
জাহাকে পবসুবামে পঠাইল আপনে॥
অস্ত্রে সাস্ত্রে দাতাবন্ত (?) বনেত চতুর।
এমত জনেবে সল্যে বোলএ নিঠুব॥
তবে কি বোলিল কর্ন্নে কহত সঞ্জয়।
কর্ন্নহ পড়িব বনে মোব মনে লএ॥
সঞ্জয় বোলেন্ত কর্ন্নে চক্ষু পাক দিয়া।
সর্প হেন উঠে বিব সল্যেবে কুপিয়া॥

ঢা, বি, ২০২৪ সং পুথি (পরাগলী মহাভারত),
৩৩৭ পত্র।

যদিও সঞ্জয়ভাবতের সহিত পরাগলী ভাবতেব ভাব ও ভাষাব আশ্চর্য্যরূপ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, তথাপি স্থানে স্থানে অমিলও আছে। বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুবিষয়ক আখ্যানটীতে অমিলের কথা ইতিপূর্ব্বেই উদাহৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া অশ্বমেধপর্ব্বেব সমস্তটাই সঞ্জয়ভারতে পৃথক্। পরাগলী বা ছুটীখানী অশ্বমেধপর্ব্ব সঞ্জয়ভাবতে গৃহীত হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে ষষ্ঠীধরসুত গঙ্গাদাস সেনের অশ্বমেধপর্ব্বটি সঞ্জয়ভারতে সমাদরেব সহিত গৃহীত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, পরাগলী অশ্বমেধপর্ব্ব অপেক্ষা গঙ্গাদাসী অশ্বমেধপর্ব্ব কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট। সুতরাং যিনি সঙ্কলন করিয়াছেন, তাঁহার রসবোধ আছে। ইহা ছাড়া আর একটী কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক। মোটের উপর পরাগলী ভারত অপেক্ষা সঞ্জয়ভারতে কিছু বেশী কথা আছে। ইহাকে ভবিষ্যৎ সংযোজন বলা যায়।

পরাগলী মহাভারতেই বহু স্থানে সঞ্জয়ের ভণিতা পাওয়া যায়। কতিপয় স্থানে এই 'সঞ্জয়' ধৃতরাষ্ট্রসহচর। ইঁহারই নিকট ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন,—

তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ।"

আবার কতিপয় স্থানে সঞ্জয় 'পয়ার' বা 'পাঁচালী' রচনা করিতেছেন। আরও অনেক স্থলে সঞ্জয় শব্দ দ্ব্যর্থবোধক। কয়েকটা উদাহরণ দেখুন।

ভারতের পুন্যকথা অমৃতের ধার। ধন্দ হইয়া পাপি সুনে তথাপি নিস্তার॥
মহাপুন্য কথা এহি সুধারসময়এ। ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥
কর্ণপর্ব্ব নাশ যদি হইল এতদূরে। সঞ্জয়ে কহন্ত কথা মধুর পয়ারে॥
কান্দিয়া জিজ্ঞাসে ধৃতরাষ্ট্র নরপতি। সমরে পড়িল জদি কর্ন্ন মহামতি॥
তার পরে কি করিল পুত্র দুর্জ্জোধন। জানিলাম আজি পুনি সমুলে মরন॥
মহারনে বিক্রম দুর্জ্জয় ধনঞ্জয়। আপনা ইচ্ছাএ মোর সন্ত করে ক্ষএ॥
প্রসংসিতে জুক্ত নিন্দন অল্প চিত্তা। সঞ্জয়! কি যুক্তি তারা কৈল সে রাত্রিত॥
সঞ্জয়ে বোলেন্ত তোহ্মা সেনা গড়ে পসি। যুক্তি করে বিরগনে একখানে বসি॥"

—পরাগলী ভারতের ২০২৪ সং পুথি, ৩৬১ খ পৃষ্ঠা।

"সঞ্জয়ে কহেন্ত কথা ধৃতরাষ্ট্রে সুনে। জয়মনি কহন্ত কথা জর্ম্মজয় স্থানে॥
ভিস্ম পর্ব্বে দস দিন যুদ্ধ সমাধান। সঞ্জয়তা ভাঙ্গিয়া ভাসা করিল বাখান॥
বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃতলহরি। সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
কবিন্দ্রে কহেন কথা রস মহামতি। জেনমতে বন কৈল কৌরবের পতি॥

—২০২৪ সং পুথি, ২৪৪ ক—খ পৃষ্ঠা।

ভারতের পুন্যকথা, বিচারি পুরান পোথা, লোকে সুনি হইল মুহিত।
পাঞ্চালি প্রবন্ধ করি, সঙ্গিতা সঞ্জয় পুরি, পুন্যকথা সুনহ নিচ্চিত্ত॥

—ঐ, ৪০ খ পৃষ্ঠা।

সর্ব্বলোকে বুঝিবারে, পয়ারে রচিল তারে, বিরচিয়া কহিল সঞ্জএ।
ভারত অমৃতধার, ভবভয় তরিবার, কেবল গোবিন্দ মধুময়এ॥

—ঐ, ৯৫ ক—খ পৃষ্ঠা।

পরাগলী ভারতের এই ভণিতাগুলিতে সঞ্জয় শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অথচ এগুলি প্রকৃত ভণিতা নহে। ইহার উপর কবীন্দ্র বা শ্রীকরের ভণিতা পৃথক্ আছে।* যদি শ্রীকর বা কবীন্দ্রের ভণিতাগুলি বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে এইগুলিই প্রকৃত ভণিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এবং তাহা হইলে এই পরাগলী মহাভারতই সঞ্জয়-নামা কোনও

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার একজন কুমিল্লাবাসী ছাত্রের আনীত একখানি পরাগলী ভারতের পুথিতে 'কবীন্দ্র' ও 'সঞ্জয়ের' ভণিতা একত্র পাইয়াছেন। আমার পুথিগুলিতেও তাহাই পাইতেছি। তবে তাঁহার পরাগলী ভণিতাগুলি কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিত রহিয়াছে।

বঙ্গীয় কবির রচিত মহাভারতে পরিণত হইতে পারে। ব্যাপারটা সম্ভবতঃ তাহাই ঘটিয়াছে। পরাগলী ভারতের ভণিতিসমূহ বাদ দিয়াই সঞ্জয় মহাভারতের উৎপত্তি হইয়াছে। নতুবা ভাষার অবিভিন্নতা ঘটিবার আর কোনও উপযুক্ত কারণ দেখান যায় না।

ঢাকা মিউজিয়মের কিউরেটর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের নিকট আমি প্রথম শুনি যে, এ পর্য্যন্ত যে পাঁচখানি সঞ্জয়ভারতের পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ত্রিপুরা, কুমিল্লা ও শ্রীহট্ট অঞ্চল হইতে পাওয়া গিয়াছে এবং পরাগলী ভারতের পুথি ঐ অঞ্চলের দক্ষিণে চট্টগ্রাম হইতে পাওয়া গিয়াছে।

ভট্টশালী মহাশয়ের উক্তি হইতে একটা নূতন বিষয়ের আভাস পাওয়া যাইতেছে। যদি পরাগলী মহাভারত দক্ষিণে চট্টগ্রাম হইতে এবং সঞ্জয় ভারত উত্তরে শ্রীহট্ট বা ত্রিপুরা হইতেই পাওয়া যায়, তবে এই উভয় স্থানকেই উভয় গ্রন্থের উৎপত্তিস্থান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। যদি ত্রিপুররাজ্যে সঞ্জয়-ভারতের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে সঞ্জয়ভারত হইতে পরাগলী ভারতের ভণিতা বাদ যাইবারও একটা কারণ অনুমিত হইয়া পড়ে। পরাগলের বংশের সহিত ত্রিপুররাজবংশের প্রাচীন বিরোধের কথা পরাগলী ভারতেই উক্ত হইয়াছে। * ত্রিপুরার হিন্দু রাজা হয় ত মহাভারতের গান শুনিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং কোনও চতুর গায়ক পরাগলী মহাভারতের ভণিতা বাদ দিয়া, ঐ গ্রন্থেরই একটী সঙ্কলন ত্রিপুররাজকে গান করিয়া শুনাইয়াছিলেন। যদিও এটী একটী অনুমান মাত্র তথাপি উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

সঞ্জয় ভারত ও পরাগলী ভারতের কাব্যের মত সমগ্র গ্রন্থের পাঠের মিল কোনও দুই কবির কাব্যে কোনও কালে বা কোনও দেশে দেখা যায় না। এইরূপ মিলবশতঃই দীনেশবাবু বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচারিত মহাভারতখানিকে পরাগলী ভারত হইতে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ঠিক সেই কারণেই আমি সঞ্জয়ভারত ও পরাগলী ভারতকে অভিন্ন বলিতে সাহস করিতেছি।

আমার বোধ হইতেছে, পরাগলী মহাভারত হইতে সর্ব্বপ্রথম যে সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রকাশিত মহাভারতখানিতে মোটের উপর পাওয়া যাইতেছে। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার মিউজিয়মে কিঞ্চিদধিক দেড় শত পত্রে সম্পূর্ণ একখানি ভণিতাবিহীন মহাভারত সংগৃহীত হইয়াছে। ভণিতার স্থানে "বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরী" ইত্যাদি ভণিতিপুষ্পিকা তাহাতে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত একখানি 'ভীষ্মপর্ব্ব' ও একখানি 'স্বর্গারোহণ পর্ব্ব'ও এইরূপ সংক্ষিপ্ত ও ভণিতাবিহীন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এই দুইখানিই বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। ইহা হইতেও অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের পুথি তিনখানির

---

* ত্রিপুরার নরপতি ডরে ছাড়ে দেস।
পর্ব্বতকন্দরে গীয়া করিল প্রবেশ॥ ইত্যাদি।

ভণিতাই বিকৃত হইয়াছে। কারণ, অন্য কোনও পুথিতে সেই বিকৃতি দোষ দেখা যাইতেছে না। এই "বিজয় পাণ্ডবকথা" (বা বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত) কোনও গায়কবিশেষের হস্তে অতিরিক্ত সংযোজন দ্বারা বিপুলায়তন সঞ্জয়মহাভারতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে সেই গায়ক বা সঙ্কলনকর্ত্তা সঞ্জয়নামাও হইতে পারেন, অথবা অজ্ঞাতনামাও হইতে পারেন। তবে প্রথমে নামহীন সঙ্কলনটিতে উত্তরকালে পৌরাণিক সঞ্জয়ের নাম জুড়িয়া দিয়া ধর্ম্মগ্রন্থখানির উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও উপাদেয়তা সম্পাদনও গায়কের অভিপ্রেত হইতে পারে। পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত গ্রন্থখানিতে নিজের নাম জুড়িয়া দিলে চোর বলিয়া ধরা পড়িবারও বোধ হয় আশঙ্কা থাকিতে পারে। সেই জন্যই সম্ভবতঃ পৌরাণিক সঞ্জয়ের নাম হইতে পয়ার পাঁচালী-প্রণেতা সঞ্জয়নামক অজ্ঞাতকুলশীল কবিবিশেষের জন্মলাভ হইয়া থাকিতে পারে। কারণ, আমরা সঞ্জয়ের কোনও পরিচয় জানি না। কিন্তু শ্রীকর নন্দী তাঁহার স্বপরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং সঞ্জয়মহাভারতের বিষয়ে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত কথাগুলি জানা যাইতেছে :—

(১) সঞ্জয়মহাভারত ও পরাগলী মহাভারত অভিন্ন গ্রন্থ। কেবল সঞ্জয়মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বটি গঙ্গাদাস সেনের রচনা।

(২) ধৃতরাষ্ট্রসহচর সঞ্জয়ের নামের সহিত সঞ্জয়ের ভণিতা অনেক স্থলে মিশিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ বাঙ্গালা মহাভারতখানি সেই পৌরাণিক সঞ্জয়ের রচনা বলিয়া প্রচার করিবার একটা উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন দেখা যায়।

(৩) পরাগলী মহাভারতের পুথি চট্টগ্রাম হইতে ও সঞ্জয়ভারতের পুথি তদুত্তরবর্ত্তী ত্রিপুর-রাজের অধিকার ও কুমিল্লা এবং শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চল হইতে পাওয়া যাইতেছে।

(৪) "বিজয় পাণ্ডবকথা" (বা বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত) নামে পরাগলী মহাভারতের একখানি সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন পাওয়া যাইতেছে।

(৫) ত্রিপুরার হিন্দু রাজার আশ্রয়ে পরাগলসম্পর্কবর্জ্জিত এবং ভণিতাবিহীন এই "বিজয় পাণ্ডবকথা" সম্ভবতঃ কোনও চতুর গায়ক কর্ত্তৃক প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল।

(৬) উত্তরকালে সংযোজনাদির দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া ঐ 'বিজয়পাণ্ডবকথা'ই বিপুলায়তন 'সঞ্জয়-মহাভারতে' পরিণত হইয়াছে। সেই জন্য ইহার সহিত গঙ্গাদাস সেনের অশ্বমেধপর্ব্বটিও সংযোজিত পাওয়া যাইতেছে।

(৭) সুতরাং সঞ্জয়-মহাভারত পরাগলী মহাভারতেরই একখানি সঙ্কলনগ্রন্থ এবং উত্তরকালীয়।

(৮) পরাগলী মহাভারত সঞ্জয়-মহাভারতের বিকাশ নহে। বরং সঞ্জয়-মহাভারতকে পরাগলীর বিকাশ বলা যায়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সরস্বতীর বলি

দেবীত্রয়

প্রধান যাগের পূর্ব্বে কতকগুলি যাগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এইরূপ অনুষ্ঠেয় যাগের বৈদিক নাম 'প্রযাজ'। ইষ্টিযজ্ঞে এই রকম প্রযাজ পাঁচটী, পশুযাগে এগারটী। এগারটী প্রযাজে এগার জন দেবতার উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। এই যাজ্যামন্ত্রের নাম 'আপ্রীমন্ত্র', আর এই এগার জন দেবতাকে বলে 'আপ্রীদেবতা'। একাদশ আপ্রীদেবতার নাম—ইড়, ত্বষ্টা, দেবীত্রয় (ইড়া, ভারতী, সরস্বতী), উষাসানক্তা, তনূনপাৎ, দৈব্যহোতারা, নরাশংস, বর্হিঃ, বনস্পতি, সমিৎ ও স্বাহাকৃতি। অষ্টম প্রযাজের দেবতা ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী। এই প্রযাজে এই তিন দেবীর যজন হয়।* ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১১০ সূক্ত আপ্রীসূক্ত। ইহার ৮ম ঋক্ ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী,—এই দেবীত্রয়ের মন্ত্র। এই মন্ত্র উপদেশ করে—

> "আ নো যজ্ঞং ভারতী তুয়মেতু ইড়ামনুষ্বদিহ চেতয়ন্তী।
> তিস্রো দেবীর্ব্বর্হিরেদং স্যোনং সরস্বতী স্বপসঃ সদন্তু ॥"

দেবী ভারতী শীঘ্র আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন; মনুষ্য যেমন আগমন করে, তেমনই দেবী ইড়া এই যজ্ঞের কথা স্মরণ করিয়া আগমন করুন। তাঁহারা দুই জন এবং সরস্বতী চমৎকার কর্ম্মকারিণী, এই তিন দেবী আগমন করিয়া সম্মুখের সুখপ্রদ কুশাসনে উপবেশন করুন।

ইড়া ও ভারতী বৈদিক সরস্বতীর নিত্যসহচরী। সরস্বতীসূক্ত বাদ দিয়া অন্যান্য সূক্তের ৪০টি মন্ত্রে সরস্বতীর স্তুতি আছে। এগুলির মধ্যে অধিকাংশ মন্ত্রেই সরস্বতীর সঙ্গে ইড়া ও ভারতীর নাম পাওয়া যায়। আচার্য্য সায়ণ ১.১৩.৯ ঋগ্‌ভাষ্যে বলেন, "ইড়াদি-শব্দাভিধেয়াঃ বহ্নিমূর্ত্তয়স্তিস্রঃ"—ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী অগ্নির তিনটী শিখা বা মূর্ত্তি-বিশেষ। তিনি ১. ১৮৮. ৪ ঋগ্‌ভাষ্যে বলিয়াছেন, ইড়া পৃথিবীসম্বন্ধিনী, ভারতী আদিত্য-সম্বন্ধিনী, এবং সরস্বতী দ্যুলোকসম্বন্ধিনী বাগ্‌দেবী। তিনি আবার ১. ১৪২. ৯ ঋগ্‌ভাষ্যে বলিয়াছেন, এই দেবীত্রয় আদিত্যেরই প্রভাবিশেষ। অন্যত্র ১. ১৩. ৯ ঋগ্‌ভাষ্যে বলিয়াছেন, ইড়া বিষ্ণুপত্নী পৃথিবী, ভারতী ভারতপত্নী এবং সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এই তিন দেবী সম্পর্কে বলিয়াছেন,— প্রাণ, অপান ও ব্যানই এই তিন দেবী।

ঋগ্বেদের একটী ঋকে (১. ১৪২. ৯) ইড়া, ভারতী, মহী ও সরস্বতী, এই চারি দেবীর

---

* [illegible] অধ্যায়।

নাম একসঙ্গে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। একটী (১. ১৩. ১) ঋকে আবার ভারতীকে বাদ দিয়া ইড়া, সরস্বতী ও মহীর স্তব করা হইয়াছে।

ইড়া, ভারতী, সরস্বতী ক্রমশঃ অভিন্ন হইয়া পড়িলেন। ক্রমে দেবী সরস্বতীতে সকলের গুণ আরোপিত হইল। দেবী সরস্বতী প্রধানা হইলেন। ভারতবাসী বৈদিক যুগ হইতে এই সরস্বতীর আরাধনা করিতে আরম্ভ করেন। আজও সমগ্র ভারত তাঁহার ভক্ত। বৈদিক দেবদেবী সম্মানে, পূজায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু সরস্বতী সুদূর বৈদিক কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সমভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

সারস্বত সত্র

বৈদিক যুগের ঋষিরা, রাজারা এবং সাধারণ লোকেরা সরস্বতীতীরে যজ্ঞ করিত। আর সে সময় পাঁচটী জাতি সরস্বতী দেবীর আরাধনা করিত। এই "পঞ্চজাতা বর্দ্ধয়ন্তী" (৬. ৬১. ১২) সরস্বতীর বরে তাহারাও বড় হইয়া উঠিল। পাঁচটী জাতির উল্লেখ আমরা অনেকবার বেদে পাইয়াছি। তাঁহাদিগকে বেদে 'পঞ্চজাতাঃ', 'পঞ্চজনাঃ', 'পঞ্চজনয়ঃ', 'পঞ্চকৃষ্টয়ঃ' প্রভৃতি নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। এই পঞ্চজাত যে কাহারা, তাহা লইয়া অনেক তর্ক আছে। কেহ বলেন, তাঁহারা গন্ধর্ব্ব, পিতৃ, দেব, অসুর ও রাক্ষস। কেহ বলেন, তাঁহারা চারি জাতি ও নিষাদ। কেহ আবার অন্য রকমও ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু এ সমস্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে বৈদিক উক্তির সঙ্গতি আদৌ হয় না। বেদে কয়েক জায়গায় পাঁচটী জাতির নাম একসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পাঁচটী জাতি—অনু, দ্রুহ্যু, পুরু, তুর্বসু ও যদু। খুব সম্ভব ইহারাই পঞ্চজাতা। ইহাদের পুরোহিত ছিলেন ঋষি 'অত্রি'। ইহারা অগ্নি, সোম, মিত্র, ইন্দ্র ও সরস্বতীর উদ্দেশে প্রার্থনা করিত। আবার বেদে পাওয়া যায়, "পঞ্চজনয়া বিশা" (৮. ৫২. ৭) ইন্দ্রকে আহ্বান করিত, ইন্দ্র ছিলেন 'সৎপতিঃ পঞ্চজনয়ঃ' (৫. ৩২. ১১); অগ্নি ছিলেন 'পঞ্চজনয়ঃ পুরোহিতঃ' (৯. ৬৬. ২০); বেদে (১. ১১৭. ৩) অত্রিকে বলা হইয়াছে 'ঋষিং পঞ্চজনয়ম্'। এই পঞ্চ জাতি সরস্বতীর অতিপ্রিয় ভক্ত ছিল।

ঋষিরা সরস্বতীর উপাসনা করিতেন, তাঁহার তীরে যজ্ঞ করিতেন। ক্রমে তাঁহারা সরস্বতীর জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যে স্থানে সরস্বতী বালুকামধ্যে লুপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার নাম হইল 'বিনশন'। এই বিনশনের দক্ষিণ কূলে ষষ্ঠী তিথিতে সারস্বত সত্রের ব্যবস্থা ঋষিরা করিলেন। লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র (১০. ১৫. ১) উপদেশ করিলেন,—"দক্ষিণে তীরে সরস্বত্যা বিনশনস্য দীক্ষেরন্ সারস্বতায় ষষ্ঠ্যাং পঞ্চম্যেতি গৌতমঃ।" এই সারস্বত সত্রে পত্নীশালা, শামিত্র, সদঃশালা, আগ্নীধ্র, সমস্তই চক্রাকার করিয়া তৈরী করা হইত।

সদো যজ্ঞাগারং চক্রীবদাকারং ভবতি।—শা. শ্রৌ. সূত্র ১৩. ২৯. ৭

আগ্নীধ্রমগ্যাগারং তথৈব চক্রীবদাকারং ভবতি।—১৩.২৯ ৮

উল্‌খলবুধ্নাকারো যূপো ভবতি।—১৩.২৯.৯

এই সারস্বত সত্রে সরস্বতীর জন্ম একটী 'মেষী' বলি দিবারও ব্যবস্থা হইল। এই বলি সৌত্রামণীযাগেই বিহিত হইল। শাঙ্খায়ন ব্যবস্থা দিলেন,—

"তস্য সৌত্রামণস্যাশ্বিনঃ পশুর্লোহিতেন বর্ণেন বিশিষ্টঃ সারস্বতী চ মেষী ইত্যেতৌ পশূ উপালম্ভৌ সবনীয়স্য।—১৩ ১৩.১

নানা দেবতার নিকট অনেক রকম বলির ব্যবস্থা আছে। ইন্দ্রের নিকট গো ও মহিষ বলি দেওয়া হয় (শ ব্রা. ৫. ৫. ৪. ১)। অশ্বমেধযজ্ঞে সোমও পূষার নিকট ঘনধূসর বর্ণের ছাগ (শতপথ-ব্রা—১৩.২.২.৬) অগ্নির নিকটও ছাগ—তবে তার ঘাড়টী কাল হওয়া চাই (ঐ. ১৩.২.২.৩); অশ্বিদ্বয়ের নিকট লোহিত ছাগ, তবে নীচের দিক্‌টা কাল (ঐ ১৩. ২.২.৫), বায়ু ও সূর্য্যের নিকট সাদা ছাগ, যমের বলিতে কৃষ্ণছাগের প্রয়োজন (ঐ ১৩. ২.২.৭)। বিশেষ লোমশ উরুযুক্ত ছাগ না হইলে ত্বষ্টার বলি হইবে না (ঐ ১৩ ২.২ ৮)। সরস্বতীর সাধারণতঃ মেষী—ছাগ হইলেও চলে (ঐ ১৩. ২.২.৪)।

কৌষীতকি, লাট্যায়ন, আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব ও বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র এই সমস্ত বিধির অনুমোদন করিলেন।

সরস্বতীযাগ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগ্রন্থে অনেক আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়।

সোমক্রয়ে সরস্বতী

সোমযাগে সোম না হইলে চলে না। এই সোমকে বৈদিক সাহিত্যে রাজা বলিয়া বর্ণনা করাও হইয়াছে। একটা প্রাচীন প্রবাদ ছিল যে, দেবতারা রাজা সোমকে পূর্ব্বদিকেই ক্রয় করিয়াছিলেন। ইহা হইতে নিয়মই হইয়া গেল যে, ঋত্বিকেরা প্রাচীন বংশের পূর্ব্বদিকেই সোমক্রয় করিবে [ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, তৃতীয় অধ্যায়]। যাহা হউক, রাজা সোম গন্ধর্ব্বদের নিকট ছিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁহাদের নিকট সোমকে আনিবার জন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেখানে বাগ্‌দেবী বাক্ উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, দেখ, গন্ধর্ব্বেরা স্ত্রীকামী; আমাকেই তোমরা সোমের মূল্যস্বরূপ কর। দেবগণ কিন্তু বাক্‌কে ছাড়িয়া থাকিতে রাজী নন। তখন বাগ্‌দেবী বলিলেন, তোমরা আমাকে দিয়াই সোম ক্রয় কর; যখনই তোমাদের দরকার হইবে, তখনই আমি তোমাদের নিকট আসিব। অগত্যা দেবতারা তাহাতেই সম্মত হইলেন। বাগ্‌দেবী মহতী নগ্নরূপধারিণী হইয়া গন্ধর্ব্বদিগের নিকট গমন করেন, তবে তিনি অগ্নিপ্রণয়নের সময় পুনরায় ফিরিয়া আসেন [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৫ম অধ্যায়, ১ম খণ্ড]। তৈত্তিরীয়-সংহিতা (৬.১৬.৫), মৈত্রায়ণী-সংহিতা (৬.৭.৩) ও শতপথব্রাহ্মণে আখ্যানটী রূপান্তরিত। শতপথের আখ্যানটী এই,—

শতপথ-ব্রাহ্মণ বলেন (৩.৫.১.১৩)—পূর্ব্বে আদিত্যগণ ও অঙ্গিরোগণই ছিলেন। অঙ্গিরোগণ প্রথমে যজ্ঞের আয়োজন করেন। তাঁহারা আয়োজন শেষ করিয়া তার পরদিন আসিয়া যজ্ঞ করাইবার জন্য অগ্নিকে তাঁহাদের আহ্বান করিতে পাঠাইয়া দিলেন। আদিত্যগণ কিন্তু পরামর্শ করিল যে, তাঁহারা অঙ্গিরোগণের নিকট যাইবেন না, বরং তাঁহারাই তাঁহাদের নিকট আসিবেন। তাঁহারা সোমযাগ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তাঁহারা সেই দিনই যজ্ঞের আয়োজন করিয়া অগ্নিকে বলিলেন, আজই আমরা যজ্ঞ করিব, ইহা আপনি ও অঙ্গিরোগণ জানিয়া রাখুন। তবে আপনাকে আমাদের যজ্ঞে হোতা হইতে হইবে। আদিত্যগণ অন্য কাহাকে দিয়া অঙ্গিরোগণকে সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহারা অগ্নির উপর বেজায় চটিয়া গেলেন। অগ্নি বলিলেন, তিনি কি করিবেন, নিরপরাধ আদিত্যগণ তাঁহাকে বরণ করিলেন, তিনি তাঁহাদের কথা ফেলিতে পারিলেন না। অগত্যা অঙ্গিরোগণ উপায়ান্তর নাই দেখিয়া আদিত্যগণকে যজ্ঞ করাইলেন। আদিত্যগণ দক্ষিণা-স্বরূপ দিবার জন্য বাক্‌কে আনয়ন করিলেন। অঙ্গিরোগণ বাক্‌কে গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না; বলিলেন, ইঁহাকে গ্রহণ করিলে আমাদের ক্ষতি হইবে। কিন্তু দক্ষিণা ব্যতীত যজ্ঞ পূর্ণ হইবে না। কাজেই তাঁহারা সূর্য্যকে আনিলেন, অঙ্গিরোগণ সূর্য্যকে দক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করিলেন। ইহাতে বাক্ বড়ই রাগিয়া গেলেন, বলিলেন, সূর্য্য কোন্ গুণে আমার চেয়ে বড় যে, তাঁরা আমাকে গ্রহণ না করিয়া সূর্য্যকে গ্রহণ করিলেন? এই কথা বলিয়া তিনি ইঁহাদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। আদিত্যগণ বলিলে দেবতাদের বোঝায়, অঙ্গিরোগণ অসুর। বাক্ ক্রুদ্ধ হইয়া সিংহীরূপ ধারণ করিলেন।* দেবাসুরদের মধ্যে যাহা কিছু সম্মুখে পাইলেন, তাহাই নষ্ট করিতে লাগিলেন। দেবাসুররা অস্থির হইয়া পড়িলেন। দেবতাদের পক্ষ হইতে অগ্নি এবং অসুরদের পক্ষ হইতে সহরক্ষ দূতরূপে প্রেরিত হইলেন। বাকের ইচ্ছা, দেবতাদের নিকট ফিরিয়া যান। তাই তিনি দেবতাদের বলিলেন, তোমাদের নিকট গিয়া আমার লাভ কি? দেবগণ বলিলেন, তিনি এমন কি, অগ্নিরও আগে যজ্ঞাহুতি পাইবেন। তখন বাক্ সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণেরই নিকটে গমন করিলেন।

সোম ছিলেন দিব্যধামে, আর দেবতারা ছিলেন এই পৃথিবীতে। দেবতাদের ইচ্ছা হইল, সোম তাঁহাদের নিকট আসেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যজ্ঞের সুবিধা হইবে। গায়ত্রী সোম আনিবার জন্য আকাশে ছুটিলেন। সোম লইয়া যখন তিনি আসিতেছিলেন, তখন গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু তাহা অপহরণ করিলেন। দেবগণ সমস্ত সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, গন্ধর্ব্বেরা স্ত্রীকামুক; বাক্‌কে তাহাদের নিকট পাঠান যাক্, তিনি সোম লইয়া আমাদের নিকট আসুন। বাক্ প্রেরিত হইয়া গন্ধর্ব্বদের নিকট হইতে সোম লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

---

* জৈমিনীয় ব্রাহ্মণেও (৩. ১৮৭) সিংহীরূপ ধারণের কথা আছে।

গন্ধর্ব্বগণ পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া বলিল, 'সোম তোমাদের, বাক্ কিন্তু আমাদের।' দেবগণ বলিলেন, আচ্ছা, তাই হউক, তবে বাক্ যদি এখানে আসেন, তোমরা জোর করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইও না ; এস, আমরা উভয়েই তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করি। তাহাই হইল। গন্ধর্ব্বেরা তাঁহার নিকট বেদপাঠ করিতে লাগিল। দেবগণ বীণার সৃষ্টি করিয়া বসিয়া বসিয়া বীণা বাজাইয়া ও গান করিয়া তাঁহাকে প্রমোদিত করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন, আমরা তোমারই গান করিব, তোমাকেই প্রমোদিত করিব। সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধা বাক্ দেবগণের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।—এইরূপে বাক্ ও সোম দেবতাদের নিকট রহিলেন।—শতপথব্রাহ্মণ, ৩.২.৪.১-৬।

এই আখ্যানটী তৈত্তিরীয়-সংহিতা ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে। কিন্তু অতি সামান্য ও অন্যরূপ। তৈত্তিরীয়-সংহিতা বা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বীণার কোন উল্লেখ নাই। কৃষ্ণ যজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয়-সংহিতায় বাকের বীণার কথা আছে। একবার বাক্ যজ্ঞের কার্য্যে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিয়া দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া যান। বৃক্ষস্থিত শব্দরূপা বাক্ই দুন্দুভি, বীণা ও তুনবের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। নৈঘণ্টুকে (৫ ৫, নিরুক্ত ১১. ২৭) বাক্‌কে অন্তরীক্ষ-দেবতাদিগের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। আর নিরুক্তে আমরা পাই, বজ্রই অন্তরীক্ষদেবতা বাক্। কৌষিতকী ব্রাহ্মণের (১২.২) 'সরস্বতীতি তদ্দ্বিতীয়ং বজ্ররূপম্' এই উক্তি নিরুক্তসিদ্ধান্তের বীজ বলিয়া মনে হয়।

সরস্বতীর বলি

শতপথব্রাহ্মণে সরস্বতীর বলি কেমন করিয়া হইল, সে সম্বন্ধে একটী আখ্যান আছে, তাহা এইরূপ :—ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ। ইন্দ্রের সঙ্গে বিশ্বরূপের বিবাদ ঘটে, ফলে ইন্দ্র বিশ্বরূপকে নিহত করেন। বিশ্বরূপ হত হইলে ত্বষ্টা ইন্দ্রের উপর খুব চটিয়া গেলেন। ইন্দ্রকে শিক্ষা দিবার জন্য আশ্চর্য্য যাদুশক্তিসম্পন্ন সোমরস তিনি আনয়ন করিলেন। ইন্দ্র যাহাতে তাহা পান করিতে না পারেন, তাহারও তিনি ব্যবস্থা করিলেন।[১] ইন্দ্র কিন্তু তাহা পান করিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইলেন। তিনি যজ্ঞার্থ আনীত ত্বষ্টার এই সোমরস জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া সমস্ত পান করিলেন। কাজটা ভাল হইল না, তাহাতে যজ্ঞ পণ্ড হইয়া গেল। আর এই কার্য্যের ফল ইন্দ্রের নিকট অতি সাঙ্ঘাতিক হইল। তিনি এই

১। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১ম খণ্ড, ৩৫ অধ্যায়) ব্যাপারটী অন্য রকমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইন্দ্র ত্বষ্টাকে মারিয়া ব্রহ্মহত্যাকারী হন। ত্বষ্টা তখন বৃত্র নামক ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করেন। ইন্দ্র তাহাকেও হত্যা করেন। ইন্দ্র যতিবেশী রাক্ষসদের মারিয়া বুনো কুকুরদের দিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশধারী অরুর্মঘদের বধ করিয়াছিলেন। বৃহস্পতিকে প্রতিহত করিয়াছিলেন। এই পাঁচ অপরাধে দেবতারা ইন্দ্রকে বর্জন করিলে ইন্দ্র সোমপানে বঞ্চিত হন। কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ-উপনিষদ্ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই উপাখ্যানগুলি আছে।

সোমরস পানের ফলে ছটফট করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি অঙ্গ হইতে বীর্য্য (ইন্দ্রিয়) খসিয়া পড়িতে লাগিল। ইন্দ্র তাঁহার তেজ, বলবীর্য্য সব হারাইয়া ফেলিলেন[২]।

অসুর নমুচি ইন্দ্রকে জব্দ করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। তিনি এই সময় ঝোপ বুঝিয়া কোপ পাড়িলেন[৩]। নমুচি ইন্দ্রের শারীরিক দৌর্ব্বল্য দেখিয়া তাঁহাকে সুরার সাহায্যে বিশেষরূপে বলহীন করিয়া সোমের প্রভাব নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া দেবতারা হায় হায় করিতে লাগিলেন। দেবতারা বলিলেন, যিনি ইন্দ্রকে আরাম করিতে পারিবেন, তাঁহারা তাঁহাকে পশুবলি প্রদান করিবেন। শেষে তাঁহারা স্থির করিলেন, অশ্বিদ্বয়কে ছাগ এবং সরস্বতীকে মেষ বলি দেওয়া হইবে।[৪] এদিকে ইন্দ্র রোগমুক্তির জন্য ভিষকের সাহায্য গ্রহণ করা দরকার বোধ হয় মনে করিলেন। বৈদিক যুগে ভিষক্ ছিলেন অশ্বিদ্বয়। তাহার পরেও বরাবর তাঁহাদের ভিষক্ বলিয়া খ্যাতি আছে। শুক্ল যজুর্বেদ সরস্বতীকেও ভিষক বলিয়াছেন শুধু তাহাই নয়, ভিষক যে অশ্বিদ্বয়, যজুর্বেদ সরস্বতীকে তাঁহাদের পত্নীও বলিয়াছেন। নদীরূপা সরস্বতীর সুস্থতাসম্পাদনকারিণী শক্তির পরিচয়ও আছে। অশ্বিদ্বয় যখন নমুচির নিকট হইতে সোম গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেবী সরস্বতী তাহা সংস্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। ইন্দ্র অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতীর নিকট গমন করিলেন। শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করুন। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন,—আমি নমুচির নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, দিবসে কিংবা রাত্রিকালে আমি নমুচিকে নিহত করিব না। দণ্ডাঘাতে, ধনু দ্বারা, মুষ্টি কিংবা হস্ত দ্বারা তাহাকে মারিব না। শুষ্ক কিংবা আর্দ্র দ্রব্য দ্বারা তাহাকে মারিব না। তবুও সে আমাকে বলহীন নিস্তেজ করিল। আমি যাহাতে আমার বল ফিরিয়া পাইতে পারি, আপনারা তাহার উপায় করিয়া দিন। সরস্বতী ইন্দ্রকে রোগমুক্ত করিবার জন্য সৌত্রামণী যাগের সৃষ্টি করিলেন। ইন্দ্র নীরোগ হইয়া তেজোলাভ করিলেন। সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয় জলাভিসেচনপূর্ব্বক ইন্দ্রের জন্য বজ্র তৈরী করিয়া দিলেন। তখন ইন্দ্র নমুচিকে মারিবার জন্য উদ্যত হইলেন। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে অথচ সূর্য্যও উদিত হয় নাই, এমন সময় ইন্দ্র না-শুষ্ক না-আর্দ্র অভিষিক্ত ফেনের দ্বারা নমুচির শিরশ্ছেদ করিলেন।[৫]

সরস্বতী অশ্বিদ্বয়ের সাহায্যে সৌত্রামণী যাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি মেষ বলিস্বরূপ পাইয়াছিলেন। তাই সৌত্রামণীযাগে ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয়ের বলির সহিত সরস্বতীর উদ্দেশে মেষ বলিও দেওয়া হইত।

২। শতপথ-ব্রাহ্মণ ১২. ৭. ১. ১-২

৩। ঐ ১২. ৭. ১. ১০

৪। শতপথব্রাহ্মণ ১২. ৭. ১. ১০-১২

৫। „ ১২. ৭. ৩. ১—৪

শ্রৌতসূত্রকার কাত্যায়ন উপদেশ করেন যে, সোমযাগে বিভিন্ন দেবতার নিকট জীববলি দিতে হয়। কেশবপনীয়ের একমাস পরে অথবা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১. ৮. ১৯) মতে পক্ষান্তে অমাবস্যার দিন ও শুক্লা প্রতিপদে "ব্যুষ্টিদ্বিরাত্র" করিতে হয়। ব্যুষ্টিদ্বিরাত্র করিতে হইলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র সোমযাগ করিতে হয়। অতিরাত্রের সঙ্গে ষোড়শী যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে। ষোড়শীতে ইন্দ্রের দাবী। তাঁহার নিকট তিনটি বলি দিতে হয়। কাত্যায়নসূত্রের (৯. ৮. ৫) নির্দ্দেশ এই যে, অতিরাত্রে সরস্বতীর নিকট চতুর্থ বলি দিতে হয়। তারপর একমাস পরে অথবা শ্রাবণী পূর্ণিমায় 'ক্ষত্রধৃতি' নামক অগ্নিষ্টোম করিতে হয়। তারপর কৃষ্ণপক্ষে সৌত্রামণী যাগ। সৌত্রামণী যাগে অনেক বিশেষ করণীয় আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণ (৫. ৫. ৪. ১) বলিতেছেন,—

"শ্বেত আশ্বিনো ভবতি। শ্বেতাবিব হ্যশ্বিনাববিপ্রলূহা সরস্বতী ভবত্যযভমিন্দ্রায় সুত্রাম্ণ আলভতে ত্বর্ব্বেদা এবং সমৃদ্ধাঃ পশবো যদ্ধ্যেবং সমৃদ্ধান্ বিন্দেদপ্যজানে বালভেরংস্তে সুশ্রপতরা ভবন্তি স যদ্যজানা লভেরং লোহিত আশ্বিনো ভবতি তদ্‌যদেতয়া যজতে।"

অশ্বিদ্বয় লোহিতাভ শ্বেত বলিয়া তাঁহাদের নিকট লোহিতাভ শ্বেত ছাগ বলি দিতে হয়। সরস্বতীর নিকট মেষ (এড়ক) বলি দিতে হয়।

সম্পূর্ণ সোমযাগের সাতটি অঙ্গ। সপ্তম ও শেষ অঙ্গ হইল বাজপেয়। অতিরাত্র ও অপ্তোর্যাম ছাড়া বাজপেয় একটি স্বতন্ত্র যাগ। বাজপেয়েও ষোড়শী যাগ করিয়া তিনটি বলি দিতে হয়। তারপর সরস্বতীর নিকট চতুর্থ বলি দিতে হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞে মধ্যম দিনে নানা দেবতার উদ্দেশে অন্যূন ৩৪৯ গ্রাম্য ও আরণ্য পশু যূপে ও যূপান্তরালে বাঁধিয়া রাখা হইত। যাহাদের যূপে বাঁধা হইত, তাহাদের মধ্যে সকল রকম পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গই থাকিত। অন্যান্য বিশেষ বিশেষ দেবতার ন্যায় বাক্ ও সরস্বতীর জন্য পৃথক্ বলির ব্যবস্থা ছিল। সরস্বতীর জন্য মেষী, বৎসতরী প্রভৃতি গ্রাম্য পশু এবং পুরুষবাক্ অর্থাৎ মানুষের মত কথা কহিতে পারে, এমন শারিকা প্রভৃতি আরণ্য পশু থাকিত। গ্রাম্য পশুগুলিকে সত্য সত্যই বলি দেওয়া হইত, আর আরণ্য পশুগুলিকে মন্ত্রবলি দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় সরস্বতীর বলির একটা ব্যবস্থা আছে। বাক্‌শক্তিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি ভালরকম কথা বলিতে না পারে, তাহাকে সরস্বতীর জন্য একটি মেষী হনন করিতে হইবে। কারণ, সরস্বতীই বাক্। সরস্বতীর নিকট মেষী বলি দিলে সে ব্যক্তি দেবীর প্রসাদে বাগ্‌বিভব লাভ করিবেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে একটি মেষী সরস্বতীর বলি। ইহাকে ঘোড়ার হনুর নীচে বাঁধিবার নিয়ম *।

সরস্বতীর বলি সম্বন্ধে শতপথ-ব্রাহ্মণে আর একটী আখ্যান আছে। প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্লান্তি নিবারণের জন্য তিনি প্রযত্ন করিলেন। প্রজাগণ তাঁহার নিকট হইতে অপসৃত হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে নিকটে আনিতে

---

* । শতপথব্রাহ্মণ, ১৩. ২. ২. ৪

প্রযত্ন করিলেন। তিনি এগারটী বলির পশু ঈক্ষণ করিলেন। তাহাতে নিজের মধ্যে বলাধান হইল। প্রজাগণ তাঁহার নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিল। বলি প্রদান করিয়া তিনি অধিকতর সুস্থতা লাভ করিলেন। এই জন্য যজমান প্রজা ও ধনলাভ করিবার জন্য একাদশটী বলি দিয়া থাকে। প্রথম অগ্নির বলি, দ্বিতীয় সরস্বতীর বলি, তৃতীয় পূষার বলি। এইরূপে সোম, বৃহস্পতি, বিশ্বেদেব, ইন্দ্র, মরুৎ, ইন্দ্রাগ্নি, সবিতা ও বরুণের বলি দিতে হয়।[৭] সরস্বতীর বলি দিতে হয়, কেন না, শতপথ বলেন, সরস্বতীই বাক্। এই বাকের দ্বারা প্রজাপতি পুনরায় বলসঞ্চয় করিলেন। বাক্ তাঁহার দিকে ফিরিলেন, বাক্ আপনাকে তাঁহার বশবর্ত্তিনী করিলেন। বাকের দ্বারা তিনি শক্তিমান্ হইলেন।[৮]

শতপথব্রাহ্মণ সরস্বতীকে চরু দিবারও ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইন্দ্র দেবতাদিগকে লইয়া বজ্রের সাহায্যে বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন। বাক্ দেবগণকে ("বৃত্রকে) প্রহার কর, বধ কর" এই কথা বলিয়া অনুমোদন ও উৎসাহদান করিয়াছিলেন। আর বাক্ই সরস্বতী; সুতরাং সরস্বতীর জন্য চরুর ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই জন্য সাকমেধ যজ্ঞে মহাহবির মধ্যে সরস্বতীকে চরু দিতে হয়।[৯]

যে সমস্ত দেবতার কাছে সংসৃপ্ হবি দেওয়া হয়, কৃষ্ণযজুর্বেদে তাহাদের একটী তালিকা আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতা (১.৮.১৭) ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১.৮.১) এইরকম তালিকা আছে। তালিকায় দেবতার নাম, যথা—অগ্নি, সরস্বতী, সবিতা, পূষা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বরুণ, সোম, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু।

সরস্বতীর নিকট পশুবলির কথা আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রেও (৩.৯.২) আছে।—

আশ্বিন সারস্বতৈন্দ্রাঃ পশবঃ। বার্হস্পত্যো বা চতুর্থঃ।২

এখন আমরা বৈদিক সাহিত্য হইতে দুইটী জিনিস পাইলাম। সরস্বতীর নিকট পশুবলি এবং তাঁহার জন্য চরু দানের ব্যবস্থা। দুইটীই যে প্রথারূপে পরযুগেও প্রচলিত ছিল, সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার নিদর্শন আছে। পতঞ্জলি ১৫০ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রণীত মহাভাষ্যের প্রথম আহ্নিকে উপদেশ করিয়াছেন,—

"সারস্বতীম্। 'যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি।—

আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্বপেদিতি।' প্রায়শ্চিত্তীয়া মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।"

আহিতাগ্নি অর্থাৎ সাগ্নিক ব্যক্তি অপশব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রায়শ্চিত্তের জন্য সারস্বতী ইষ্টি করিবে। প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য না হই, এই জন্য ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত।

দেখা যাইতেছে, লোকে যজ্ঞ করিবার সময় মধ্যে মধ্যে অপশব্দ প্রয়োগ করিয়া ফেলিত। অপশব্দ প্রয়োগ করিলে প্রয়োগকর্ত্তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। সেই

৭। শতপথব্রাহ্মণ ৩. ৯. ১. ৮। শতপথব্রাহ্মণ ৩. ৯. ১. ৭. ৯। শতপথব্রাহ্মণ [illegible]

প্রায়শ্চিত্তের নাম সরস্বতী-যাগ বা সারস্বতী ইষ্টি। মনুসংহিতায়ও এই সারস্বত-যাগের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেও এই যাগের উদ্দেশ্য প্রায়শ্চিত্ত; কিন্তু তাহা অপশব্দ প্রয়োগের জন্য নয়—সত্যের অপলাপের জন্য, সাক্ষ্য দিতে গিয়া সত্য কথার পরিবর্ত্তে মিথ্যা কথা বলার জন্য। শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ প্রমাদের বশবর্ত্তী হইয়া এমন একটী কুকর্ম্ম করিয়া ফেলিল, যাহার ফলে তাহাকে বধদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। মনু বলেন (৮. ১০৪), যেখানে সত্যকথা বলিলে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইবে, সেখানে মিথ্যা কথা বলাই উচিত। এখানে মিথ্যা সত্য অপেক্ষা প্রশস্ত। যাজ্ঞবল্ক্যও (২.৮৩) এই ভাবের কথা বলিয়াছেন।

কিন্তু যিনি মিথ্যা কথা বলিবেন, তাহাকে এই জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মনু বলিয়াছেন,—

"বাগ্দৈবত্যৈশ্চ চরুভির্যজেরংস্তে সরস্বতীম্।
অনৃতস্যৈনসস্তস্য কুর্ব্বাণা নিষ্কৃতিং পরাম্॥" ৮।১০৫

এইরূপ মিথ্যাকথার জন্য যাঁহারা সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে চান, তাঁহাদিগকে চরু দিয়া সরস্বতীযাগ করিতে হইবে। সরস্বতীযাগে চরুই বিধি। চরু-বিধির উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। ভরত মুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রেও তাহাই বলিয়াছেন। ভরতের উক্তি এইরূপ :—

"ব্রহ্মাণং মধুপর্কেণ পায়সেন সরস্বতীম্।
শিববিষ্ণুমহেন্দ্রাদ্যাঃ সম্পূজ্যা মোদকৈরথ॥" ৩৩৭

সরস্বতীর নিকট বলির প্রথা এখনও লোপ পায় নাই। ভদ্রকালীর নিকট বলির ব্যবস্থা আছে। ভদ্রকালী সরস্বতী—নীলাভ। বাঙ্গলার বরিশাল অঞ্চলে আজও সরস্বতীর নিকট সাদা ছাগ বলি দেওয়া হয়। মাদারিপুর সবডিভিজনের অন্তর্গত কার্ত্তিকপুরেও সরস্বতীপূজার দিন সরস্বতীর নিকট ছাগ বলি দেওয়া হয়। মাদারিপুরের অন্যান্য জায়গায় এ প্রথা প্রায়ই নাই। পাবনা জেলায় সিরাজগঞ্জ মহকুমায় সরস্বতীপূজায় সাদা ছাগল বলি দিবার ব্যবস্থা আছে। বরিশালে, মাদারিপুরে এবং পূর্ব্ববঙ্গের আরও দুই এক জায়গায় ছাত্রেরা পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিতে সরস্বতীর নিকট পাঁঠা বলির মানস করিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে সরস্বতীপূজার দিন নিরামিষ ভোজনই বিধি। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে অধিকাংশ স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। বাখরগঞ্জ জেলায়, বিশেষতঃ বরিশাল, রহমৎপুর, গৈলা প্রভৃতি স্থানে সরস্বতীপূজার পূর্ব্বে কাহারও বাড়ীতে ইলিশ মাছ আসে না। ঐ দিন প্রথম ইলিশ মাছ আনিয়া খাইতে হয়। জলাবাড়ীতে ঐ দিন ইলিশ মাছ খায় এবং পাঁঠা বলি দেয়। সিরাজগঞ্জ মহকুমায়, বিক্রমপুর, মৈমনসিংহে ঐ দিন গৃহস্থগণ প্রথম ইলিশমাছ খায়। চট্টগ্রাম ও ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালীপাড়ায়ও ঐ দিন কেহ মাছ খায় না। কুমারখালি ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সীমায় অবস্থিত। এই সমস্ত স্থান

অধুনা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হইলেও পূর্ব্ববঙ্গের প্রথানুসারে সরস্বতীপূজার দিন প্রথম ইলিশ মাছ ভক্ষণের নিয়ম বজায় রাখিয়াছে।

মাদারিপুর সবডিভিজনে অধিকাংশ জায়গায়ই সরস্বতীপূজার দিন জোড়া ইলিশমাছ খাওয়ার নিয়ম আছে। যদি জোড়া ইলিশমাছ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে একটী মাছের সঙ্গে একটী লম্বা আস্ত বেগুন একসঙ্গে করিয়া জোড়া করিয়া লওয়া হয়। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলে বিজয়া দশমীর দিন কেহ কেহ জোড়া ইলিশ মাছ বাড়ীতে আনিয়া থাকেন। ইঁহারা পরেও ইলিশমাছ খাইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ঐ দিন জোড়া ইলিশ না আনেন, তাঁহারা সরস্বতীপূজা পর্য্যন্ত আর ইলিশ মাছ খাইতে পারেন না।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা পুথি*

গত কয়েক বৎসর যাবৎ সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নানা স্থান হইতে প্রাচীন সংস্কৃত পুথি সংগৃহীত হইতেছে। বর্ত্তমানে আমার উপর সেই পুথির বিবরণ প্রস্তুত ও প্রকাশের ভার অর্পিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পুথিগুলি আলোচনা করিবার সময় তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গালা পুথি আমার দৃষ্টিগোচর হয়। সংস্কৃত পুথির সঙ্গেই সেগুলি পরিষদে আসিয়া পড়িয়াছিল। মুখ্যতঃ সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করাই পরিষদের উদ্দেশ্য। তাই এতদিন এগুলি কাহারও তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তাহা ছাড়া সংখ্যায়ও এগুলি খুব বেশী নহে।

কিন্তু সংখ্যায় অল্প হইলেও ইহাদেরই মধ্যে কয়েকখানি অজ্ঞাতপূর্ব্ব ও নূতন তথ্যপূর্ণ পুথি পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে সাধারণকে কিছু জানান কর্ত্তব্য। সেই উদ্দেশ্যেই পরিষৎসংগৃহীত বাঙ্গালা পুথির মধ্যে কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য পুথি বাছিয়া লইয়া নিম্নে তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বিবরণ প্রদান করিতেছি।

সেই বিবরণ দেওয়ার পূর্ব্বে সাধারণভাবে পরিষদের পুথিগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই সংগ্রহের মধ্যে খুব প্রাচীন পুথি কিছু নাই। ১১৮১ সনে লিখিত মহাভারতের আদিপর্ব্ব, ১১৮৪ সনে লিখিত আশ্রমবাসিক পর্ব্ব এবং ১১৯৮ সনে লিখিত বিরাটপর্ব্ব, এই তিনখানি বঙ্গীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত পুথিই প্রাচীনতম। ইহা ছাড়া প্রাচীন পুস্তকের মধ্যে বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত কয়েকখানি পুথিও আছে। নূতন পুথির মধ্যে জয়গোপাল দাসের গোবিন্দমঙ্গল ও বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুই গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না। এতদ্ভিন্ন ভাষাসংক্ষেপাশৌচপ্রকরণ, রোগনির্ণয়, ভোজরাজের যুক্তিকল্পতরুর বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ (আংশিক), রাধাবল্লভ কবিশেখরকৃত ভাষাস্মৃতিসংক্ষেপ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনার নিদর্শনরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কবিচন্দ্রকৃত অক্রূর আগমন, প্রহ্লাদচরিত্র ও ভরতসংবাদ পরিষৎসংগ্রহে আছে।

বৈষ্ণবগ্রন্থের মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি সুপরিচিত গ্রন্থ ছাড়া দুইখানি নূতন গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দুইখানিই নরোত্তম দাস-রচিত। একখানি বৈষ্ণবামৃত এবং আর একখানি রসসার। বৈষ্ণবামৃতে বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে এবং বিষ্ণু-ভক্তের নানা প্রশংসা করা হইয়াছে। রসসারের বিবরণ নিম্নে অন্যান্য গ্রন্থের বিবরণের সহিত প্রদত্ত হইবে।

---

* ২০এ ফাল্গুন, ১৩৩৪, মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

এইবার কয়েকখানি পুথির বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

১। **গোবিন্দমঙ্গল।** জয়গোপাল দাসরচিত। এখানি ভাগব । অনুবাদ নহে। ইহা কৃষ্ণমঙ্গলজাতীয় গ্রন্থ; ইহাতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। কলিকাতা শ্যামবাজারের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম বসু মহাশয়ের নিকট হইতে পুথিখানি পাওয়া গিয়াছে। লেখক পশ্চিমবঙ্গের লোক হইতে পারেন। ইতঃপূর্ব্বে অন্য কোথাও এই পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া অবগত নহি।

আরম্ভ :—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

জৈর্ন্ন শ্রুতং ভাগবতং পুবাণং নারাধিতো জৈ পুরুসঃ পুরাণং।
অথেগুত্ত জৈর্ন্ন ধরামরাণাং স্তেসাং ব্রেথা জন্ম নবাধমানাং ॥
নারায়ণঃ নাম নবোবরাণাং প্রশীদ্ধচৌর কথিত পৃথিব্যাং।
অনেকঃ জন্মার্জ্জিতঃ পাপসঞ্চয়ং হরিত্যসেসং স্মৃতিমাত্রকেবলং ॥

পণমহো নারায়ণ অনাধিনিধন।
শ্রষ্টিস্থিতিপ্রলয় জাহার কারণ ॥
রশীক জনের সঙ্গে বশীলা সকল।
মন দিঞা যুন কীছু গোবিন্দমঙ্গল ॥
এ জয়গোপাল দাষ কহে শাস্ত্রমতে।
গোবিন্দমঙ্গলকথা যুনঃ জগতে ॥

মধ্য :—

কানাই হে দেও খেয়া বাহিয়া সকালে।
মথুরা জাইব বিকে সব সখি মেলে ॥ ধুয়া ॥
ঘাটেত নৌকাখানি চাপতি বনমালি।
ঘাটে বহি ডাক পাড়ে রাধিকা নহলি ॥
জোগানে উৎযুক মতি হইছে আমার।
জাইব মথুরা পুরি ঝাট কর পার ॥
আইস আইস বোলি গোপী দেয় হাতসান।
নেউটীবার বেলায় আনিঞা দিব গুয়া পান ॥
যুগন্ধি চাঁপার ফুল আনিব কৌস্তুরি।
তোমারে আনিয়া দিব যুনহ কাণ্ডারি ॥
যুনিঞা না যুনে বোলে দেখিঞা না দেখি।
মুচকী হাশীঞা কৃষ্ণ হাশে আড় আখি ॥

এ জয়গোপাল দাষ গাইল আনন্দে।
নৌকাখানি বান্ধিঞা কৃষ্ণ আইসে এ বন্ধে॥
(পত্র— ১৭৭খ – ১৭৮ক)

শেষ :—

এ জয়গোপাল দাষ গাইল কৌতুকে।
গোবীন্দমঙ্গলকথা ষুন সর্ব্বলোকে॥
গোবিন্দমঙ্গলকথা জেই জনা ষুনে।
সর্ব্ব সিদ্ধি হয় তার বিনিত সাধনে॥ ইতি কংসবধ॥

মল্লার রাগ॥

আন নাবে আরে গোবিন্দ রাম জয়।
সুনিলে কৃষ্ণের কথা ভক্তি লভ্য হয়॥ ধুয়া॥

তথাহি॥ নারায়ণো নাম নরোবরাণাং ইত্যাদি।

ভবিষ্যতে গ্রন্থখানির বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

২। **কালিকামঙ্গল**। কবিশেখরকৃত। গ্রন্থকারের পূর্ণ নাম বোধ হয়, বলরাম চক্রবর্ত্তী কবিশেখর। গ্রন্থপ্রারম্ভেই বলরাম চক্রবর্ত্তী, এই নাম পাওয়া যায়।

"বলরাম চক্রবর্ত্তি   মাগে তব পদে ভক্তি
কর প্রভু কৃপাবলোকন।"
"কালিপদসরসিজে করিয়া প্রণাম।
দিগ্‌বন্দনা গান দ্বিজ বলরাম॥" (পত্র ৫ক)

গ্রন্থমধ্যে ভণিতায় শুদ্ধ কবিশেখর, এই নামই পাওয়া যায়। তবে এই কবিশেখর কে এবং কোন্ স্থানের লোক, তাহা বলিবার উপায় নাই। কবিশেখর একটী উপাধি এবং এই উপাধি একাধিক ব্যক্তির থাকা অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ বৈষ্ণব পদকর্ত্তা কবিশেখর, সংস্কৃত প্রহসন শঠভাবোদয়ের রচয়িতা কবিশেখর, এই দুই কবিশেখরের কথা আমরা অবগত আছি।

এই গ্রন্থে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। দিগ্‌বন্দনায় বঙ্গদেশের নানা দেবীমন্দিরের উল্লেখ আছে। রচনার নমুনা,—

সাজে কন্যা বিদ্যা সতি   রাজহংসি জিনি গতি
চরণে নূপুর ঘন বাজে।
কদম্ব কোরক কুচ   গজকুম্ভ জিনি উচ্চ
মধ্যদেস গঞ্জে মৃগরাজে॥
সমর্পিল পূজা কিছু করিল ভক্ষণ।
শুইল খট্টায় চারি ভিতে সখিগণ॥

কৌতুকে মদন কড়ি দিয়া নিজ কর্ণে।
বসন্ত আলাপে গীত গায় নানা বর্ণে॥
মধুর বচনে মোহে জত সখিগণ।
প্রেমে গদগদ চিত্ত হরল গেয়ান॥
সব সখিগণ রঙ্গে মদন মোহিত।
রাধার মঙ্গল গায় বিরহচরিত॥
কালিপদ-সরসিজ-মধু-লুব্ধমতি।
শ্রীকবিশেখর কহে মধুর ভাবথি॥ (পত্র—২৭ ক)

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদে কবিশেখররচিত একথানি দেবীমঙ্গল আছে। এই গ্রন্থখানি আমাদের আলোচ্য গ্রন্থখানি হইতে স্বতন্ত্র ইহা সপ্তশতী চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ।

সেহি বাক্য মনে ধরি শ্লোক অর্থ অনুসারি
সপ্তশতি কহিল পয়ার॥

দেবীমঙ্গল ১৬৫২ শকাব্দে রচিত হইয়াছিল।

পক্ষ ভূত রিতু চন্দ্র সকের বরিষে।
বৈসাখ মাসের চতুর্ব্বিংসতি দিবসে॥

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান লইয়া রচিত বহু কবির বহু গ্রন্থের সংবাদ ইতঃপূর্ব্বেই জানিতে পারা গিয়াছে। তবে আলোচ্য গ্রন্থখানির খবর ইতঃপূর্ব্বে কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না। ভবিষ্যতে এ গ্রন্থখানির বিস্তৃত বিবরণ দিবার ইচ্ছা আছে।

৩। **রসসার**—নরোত্তম দাসকৃত। ইহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের রসতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। গুরুর প্রয়োজনীয়তা, সাত্ত্বিক গুণ, স্থায়িভাব, রস, দক্ষিণাদি নায়ক, নায়িকাভেদ, বিকৃতিরস, প্রেমবৈচিত্ত্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থে দেখা যায়। গ্রন্থশেষে সহজমতের কথা আছে। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপলক্ষেই রামী ও চণ্ডীদাসের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। নমুনাস্বরূপ ইহার পরকীয়াতত্ত্ব উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বিজাতিয় সাধুসঙ্গ না করিয় কভু।
সঙ্গ করিবা জেবা মানে নিজপ্রভু॥
পতি উপক্ষি সতি হয় সর্ব্বনাস।
পতিহিন সতিজনে সদত নৈরাস॥
পরকিয়া রস জিবে সম্ভব না হয়।
তদ্ভাবভাবিত বিনা অন্তে না ঘটয়॥
পতিসঙ্গ করি উপপতি করে ভাব।
সে জন অসেষ পাপি পাপমাত্র লাভ॥

তবে জদি কেহ বলে ব্রজে গোপীগণে।
পতি ছাড়ি কৃষ্ণসঙ্গ কৈল কি কারনে॥
দুর্গম নিগূঢ় ইহা কহিব সংখেপে।
সংখেপার্থ কবি কহি বুঝ কোনরূপে॥
নিজাঙ্গ সঙ্গে রসে ভিন্যাঙ্গ নয়।
আত্মসঙ্গিত স্বাঙ্গি ভিন্য নাহি কয়॥
তদাশ্রীত জন বিনা কে বুঝিতে পারে।
চৈতন্যের ক্রিপা ভাবি হৈয়া থাকে জারে॥
নিজঙ্গে রাধাঙ্গ একাঙ্গ হৈয়া।
আস্বাদিলা তদ্ভাব অবতারি হৈয়া॥
সবে বায় রামানন্দ জানয়ে অন্তব।
আব জানয়ে সরূপ দামোদব॥ (পত্র—১৫ব)

৪। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুবাদ।** ষষ্ঠ অধ্যায়েব কিয়দংশ পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় পত্র নাই। অনুবাদকেব নাম পাওয়া যায় নাই। অনুবাদ সর্ব্বত্র মূলানুযায়ী নহে।

আরম্ভ :—শ্রীশ্রীবাধাকৃষ্ণ সহায়॥

অথো শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাভাষা লিক্ষতে॥

জিনিতে জমেব দায় ধবণী লোটায়া কায়
বন্দো গুরুদেবেব চরণ।
জাগ জোগ কর্ম্মজ্ঞান শ্রবণ মঙ্গল ধ্যান
গুরুভক্তি মুক্তিব কাবণ॥

মধ্য:—

কৌমাব জৌবন জরা শবীরে যেমন।
বিনা জত্নে হয় জায় না রহে কখন॥
দেহান্তরে প্রাপ্তী হেন মত ব্যবহার।
পণ্ডিতে না ভুলে ভেদ জানিয়া তাহার॥
ইন্দ্রিয়গণেব হেন বিষয় সংজোগ।
তবে হয় সিত উষ্মা সুখদুঃখ ভোগ॥
রৌদ্রেতে রহিলে জেন উষ্মা পীড়া করে।
সিত লাগে রহিলেই জলের ভিতরে॥

অন্ত :—

দেহ গ্রিবা মস্তকাদি কিছু না চালিবে।
কেবল নাসীক অগ্র দৃষ্টীকে রাখিবে॥

ইন্দ্রিয় মনের চেষ্টা দূরে তেয়াগিবে।
স্ত্রিলোকের না করিবে মুখাবলোকন।
ভয় তেজি বিশয়ে বিরক্ত হবে মন ॥
আমাতে রাখিবে

৫। **যুক্তিকল্পতরু**। ভোজরাজপ্রণীত সংস্কৃত যুক্তিকল্পতরুর বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ। অনুবাদকের নাম পুথিতে নাই। পুথিখানি অসম্পূর্ণ। ইহাতে 'রাজগৃহযুক্তি' পর্য্যন্ত আছে। অনুবাদ সকল স্থলে মূলের ঠিক অনুরূপ নহে। ভাবানুবাদই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে হয়। রচনার নমুনা :—

জগতের সৃষ্টিরক্ষা বিনাশ কারণ।
প্রথমে প্রণাম করি তাঁহার চরণ ॥
শাস্ত্রকর্ত্তৃচরণ বন্দিয়া বার বার।
মুনিকৃত শাস্ত্রে যত ভাব লইয়া সাব।
ভোজরাজপ্রকাশিত যুক্তিকল্পতরু।
মনোঽভীষ্টফলদাতা নীতিশাস্ত্রগুরু ॥ ইত্যাদি

এ জাতীয় গ্রন্থ বাঙ্গালায় খুব কমই পাওয়া যায়।

৬। **ভাষাস্মৃতিসংক্ষেপ**। রাধাবল্লভ কবিবাগীশরচিত।

একদিন বাঙ্গালাসাহিত্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতসমাজে বিশেষ অনাদৃত ও অবজ্ঞাত ছিল। অন্য শাস্ত্রগ্রন্থের ত কথাই নাই—পুরাণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় আলোচনা করা নিষিদ্ধ ছিল। শুধু শুষ্ক নিষেধ নহে—তাহার সহিত ভীতিপ্রদর্শন ছিল—ভাষায় পুরাণ পাঠ করিলে নরকে বাস করিতে হইবে।

তবে কালক্রমে ব্রাহ্মণপণ্ডিতসম্প্রদায়ের এ মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তনের কারণ পুরাপুরি বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম অনুরাগ বলিয়া বোধ হয় না। অব্রাহ্মণ গ্রাম্য কবির চেষ্টায় বাঙ্গালাসাহিত্য দিন দিন যে প্রসার লাভ করিতেছিল, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা তাঁহাদের সামর্থ্যের অতীত ছিল। সেই জন্য তাঁহারাও বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে সংস্কৃতশাস্ত্র সাধারণের মধ্যে প্রচার করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতেছিলেন। তাহা ছাড়া, বাঙ্গালা ভাষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে সংস্কৃতশিক্ষার অল্পবিস্তর অবনতি যে না হইতেছিল, তাহা নহে। ফলে সাধারণের কথা দূরে থাকুক, সংস্কৃতজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের দল সৃষ্টি হইয়াছিল। ইঁহাদের কার্য্যের সুবিধার জন্য স্মৃতি ও জ্যোতিষের সাধারণ বিষয়গুলি বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করা বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা না হইলে হিন্দুধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ লোপ পাইবার আশঙ্কা ছিল।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থখানি এইরূপ উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

রাধাবল্লভের ভাষাস্মৃতির উল্লেখ ১৭২৮ শকাব্দে রচিত রাজা পৃথ্বীচন্দ্রের 'গৌরীমঙ্গল' গ্রন্থের প্রারম্ভে আছে।* পৃথ্বীচন্দ্রের উল্লিখিত রাধাবল্লভই বর্ত্তমান গ্রন্থের রচয়িতা কি না, তাহা জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই। কারণ, রাধাবল্লভের নামীয় স্মৃতিবল্লক্রম নামে আর একখানি বাঙ্গালা স্মৃতিগ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন।† এই দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে কোন্‌খানি পৃথ্বীচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

আলোচ্য গ্রন্থে অশৌচ, শ্রাদ্ধ ও তিথি, এই তিনটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহার রচনার কিছু নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"তত্রাদৌ সপিণ্ডাদিব্যবস্থা। সপিণ্ডদানব্যতিরেকে অশৌচ নির্ণয় করিতে না পারে অতএব প্রথম সপিণ্ডাদি বিচার করিতেছি। তাহাতে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত পুরুষের সপিণ্ড হয়। ইহার মধ্যে যদি পিতা পিতামহ জীবদ্দশাতে থাকে তবে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড হয়॥"

৭। কাশীদাসী মহাভারত। নূতন গ্রন্থ বলিয়া এখানির উল্লেখ করিতেছি না। তবে ইহার শেষে যে তারিখ দেওয়া আছে, তাহা আলোচনার বিষয়। এ জন্য উহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শকাব্দা বিধিমুখ করহ তৃগুণ।
রুক্মিনিনন্দন অঙ্ক জলনিধি পুন ॥
বৃসরাসি বহির্ভূত মাস সনিশ্চিতে।
ভালি দিন চন্দ্রহিন গগনবিদিতে ॥
মৃগাঙ্কমুদিতপক্ষ এক অঙ্কস্থিতে।
সসিযুত বাসরে দিজাম দিন হৈতে ॥
কাসির কৃত [কা]ব্য এই চরিত্র পাণ্ডব।
সাধুগন উপাক্ষন তরিবারে ভব ॥
আদিপর্ব্ব ভারথ কেবল সুধাসিন্ধু।
সংসারসাগরে ভাই তরিবারে বন্ধু ॥
এতদূরে আদিপর্ব্ব সমাপ্ত ॥

কবিত্ত্র অনুসারে সকাব্দা ১৬৬৪।৩।১৫॥

লিখিতং শ্রীহিদয়রাম মিত্র নিবাস গোলপুর পাটনার্থে শ্রীসাকহি রামবর্ম্মিক নিবাস নিজগ্রাম সন ১১৮১ সাল মাহ বৈশাখ ৭ দিনে পুস্তক লেখা সমাপ্ত ॥ বার সনিবারে বেলা চারি দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল ॥

---

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (৩য় বর্ষ, পৃঃ ৫০)।

† Notices of Sanskrit Manuscripts (New Series)—Vol II. p. 256.

এই স্থলে তিনটী তারিখ দেওয়া হইয়াছে—একটী অক্ষরে এবং দুইটী সংখ্যায়। শেষের তারিখটী লিপিকরের, তাহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। কিন্তু অপর তারিখ দুইটী কাহার, তাহা বুঝা যায় না। প্রথম তারিখটী শক ত্রয়োদশ শতাব্দীর। সুতরাং উহা কাশীদাসের সময় হইতে পারে না। কাশীদাস উহার দুই তিন শত বৎসর পরের লোক। দ্বিতীয় তারিখটীও কাশীদাসের পরের। সুতরাং উহা কাহাকে নির্দ্দেশ করে, বলা কঠিন।

৮। **ভরতসংবাদ**। কবিচন্দ্রকৃত। পুথিখানি ১২৪৬ বঙ্গাব্দে লিখিত। পুস্তকের নাম কোথাও দেওয়া নাই। তবে বনগত রামের সহিত ভরতের সাক্ষাৎ, ভরতকৃত রামের পাদুকাগ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপার ইহাতে বর্ণিত থাকায় ইহা রামায়ণের ভরতসংবাদ বলিয়াই মনে হয়। এই গ্রন্থে একটী নূতন কথা আছে—ইহাকে 'দশম স্কন্ধের কথা' বলা হইয়াছে।

'দশম স্কন্ধের কথা কবিচন্দ্র গায়' (৯খ, ১০ পত্র)

রামায়ণের এই অংশকে 'দশম স্কন্ধের কথা' বলিবার কারণ কি, বুঝিলাম না।

৯। **সত্যনারায়ণের পাঁচালী**। রামকান্তরচিত। ইহার পরিচয় গ্রন্থশেষে এইরূপ দেওয়া আছে,—

"রামকান্ত মন্দিপাটি আধারে মানিকে বাটী
দেবের আদেশ পেয়ে কয়।"

গ্রন্থখানি বোধ হয়, রাজসাহী অঞ্চলে রচিত। এ জাতীয় পাঁচালীতে প্রসিদ্ধ কাঠুরিয়াগণকে পাহাড়পুর অঞ্চলের বলা হইয়াছে। 'পাহাড়পুরের কাঠুরিয়া যত।' সাধু ঢাকানিবাসী স্বর্ণবণিক্ রূপসাহা।

সেই দিন এক সাধু ঢাকা হত্যা ডিঙ্গা
লাগায়েছে কুলে।
হৈম বান্স্যা জাতে রূপসাহা নাম
নিবাস গৌড় বাদসাহি॥

সাধুর কন্যা মনোরমা। বল্লভ শেঠের পুত্র কালীকান্তের সহিত তাহার বিবাহ হয়।

আদিশূরধাম বঙ্গে গ্রাম পঞ্চসার।
লক্ষ টাকা পাঠাইয়া করিল সমাচার॥
বল্লভ সেটের সুত কালিকান্ত নাম।

স্থান ও পাত্রপাত্রীর এইরূপ নাম এ জাতীয় অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

সাধুর নানা জাতীয় বহু ডিঙ্গা ছিল। যথা—খুরশান, হংসরাজ, ঢোলপাটী, জঙ্গীউঠ, বাঘঝাপি, সোনাভাষী, জয়রাজ ইত্যাদি (পত্র—৬ ক—খ)। সিংহলযাত্রার পথে অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ, নবদ্বীপে বুড়াশিব, গোপতিপাড়ায় রঘুনাথ, ফুলিয়ায় আষাড়ুক (?), ত্রিবেণীতে দরফ খাঁ, রাঙ্গাফলায় কাহুরায়কে প্রণাম করিবার কথা আছে। গ্রন্থক্রমে

কম্পাশ যন্ত্র, দূরবীণ ও মাদ্রাজ নগরের উল্লেখ আছে। ইহাতে গ্রন্থখানিকে খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না।

শিবচন্দ্রপ্রণীত একখানি স্বতন্ত্র সত্যনারায়ণের পাঁচালীও পরিষৎসংগ্রহে আছে। তবে তাহাতে নূতনত্ব কিছু নাই।

১০। **প্রেমভক্তিসার**—গুরুদাস বসুকৃত। এই গুরুদাস বসু কলিকাতা শ্যামবাজারের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম বসু মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ। ইনি একজন সুকবি ছিলেন। ইঁহার রচিত কতকগুলি গান আমাদিগেব হস্তগত হইয়াছে। ইঁহার রচনার ভাষা সুললিত, কোথাও কষ্টকল্পনা বা কাঠিন্য নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভক্তিতত্ত্ব সবল বাঙ্গালা পদ্যে এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

রচনার নমুনা—

কল্পবৃক্ষেব রত্নযোগ পীঠেব উপর।
কায়মনে ভজ মন কিশোরি কিশোর॥
পূর্ব্বাপর বেদশাস্ত্রে আছয়ে সকল।
পবে গোস্বামিপাদে তাহা করিলা উজ্জল॥
তাহাব কিরণ লাগে ভক্তগণেব গায়।
মূর্খ বুঝাইতে তাঁবা বর্ণিলা ভাষায়॥
তার লেশ বর্ণিতে যে হয় মোর মন।
পঙ্গু যেন চায় গিরি করিতে লঙ্ঘন॥ (৬ খ পত্র)

যদি রিপু হবে জয়ী　　মনোযোগে শুন কহি
শাস্ত্রেব সিদ্ধান্তসারোদ্ধার।
রক্ষক করহ ভক্তি　　রিপু হউক হীনশক্তি
ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা তুচ্ছ কর॥ (৮খ পত্র)

বৈষ্ণবশাস্ত্র হইতে সংস্কৃত বচন উদ্ধার করিয়া গ্রন্থকার নিজের উক্তিগুলি প্রমাণিত করিয়াছেন।

ইঁহার রচিত একটী গানের নমুনা নীচে দেওয়া হইল,—

প্রাণসখি আদি শ্রীমতির জন্ত পৃয়া।
রাধার মন্দিরে সভে মিলিল আশিয়া॥
সভে পুছে দূতি গো গিয়াছে কতদিন।
অন্তরে উথলে আজি দেখি শুভদিন॥
সুখভরে বুক কাঁপে দোলে হিয়ার হার।
রাই বলে কালী হৈতে অমনি গো আমার॥

কেহ বলে বাম অঙ্গ লাগিছে নাছিতে।
রাই বলে অমনি আমার তিন দিন হইতে॥
আপনা হইতে আজি হৃদপদ্ম ফুটে।
তাহা হইতে কতোই বা সুখের গন্ধ উঠে॥
এত দিনে বিধি বুঝি হইল সদয়।
অদূরে মাধব বসু গুরুদাসে কয়॥

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন *

সূচনা

বঙ্গভাষায় রচিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক সাহিত্যে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনকে আদিগ্রন্থ বলিয়া মনে করা হয়। এ পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির রচনা আমরা পাই নাই। এই শ্রেণীর সাহিত্যে শুধু বঙ্গদেশে নয়, বঙ্গদেশের বাহিরেও চণ্ডীদাসের ন্যায় গীতি-নাট্যকার বড় একটা দেখা যায় না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ইহার সাহিত্যিক দিক্‌টাকে ততটা মর্য্যাদা দান করেন নাই, যতটা ইহার ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের দিকে মনোযোগ দিয়াছেন। তাঁহার পরে এ গ্রন্থ লইয়া যত আলোচনা হইয়াছে, তাহাও শুধু ঐ দিক্ হইতে। আমার মনে হয়, কৃষ্ণকীর্ত্তন যখন সাহিত্য-গ্রন্থ, তখন সাহিত্য হিসাবেই ইহার বিচার হওয়া আগে দরকার।

কোন উপযুক্ত ব্যক্তি এই কাজে হস্তক্ষেপ করেন নাই দেখিয়া গত ১৩২৮ সালে (ইং ১৯২১-২২) যখন আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে গবেষণার জন্য রামতনু লাহিড়ী-রিসার্চ্চ স্কলার নিযুক্ত হই, তখন কৃষ্ণকীর্ত্তনের সাহিত্য-বিচারের দিক্‌টা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে ও আমি যথাসাধ্য অনুসন্ধান ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। সেই সময়ে আমি যে সব বিষয় এই গ্রন্থ সম্পর্কে লক্ষ্য করি, তাহা এখন আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। আশা করি, আপনাদের বিচার ও আলোচনার দ্বারা আমার ত্রুটিগুলি সংশোধিত হইবার উপায় হইবে।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের একটা বিশিষ্টতা ও অসামান্যতা আছে, যাহা কোন প্রাদেশিক ভাষায় রচিত অনুরূপ গ্রন্থে দেখা যায় না। আমরা বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তী প্রবন্ধসমূহে দেখিতে পাইব, খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন পুরাণে ও কাব্যে কৃষ্ণকথা যে যে স্তরের ভিতর দিয়া আসিয়াছিল, তাহা প্রায় সমস্ত কৃষ্ণকীর্ত্তনে বর্ত্তমান আছে। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ মন্থন করিয়া চণ্ডীদাস তাঁহার গীতিনাট্যখানি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই সব সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-সাহিত্য ব্যতিরেকে অন্যান্য পুরাণ, যথা—অগ্নি, পাদ্ম প্রভৃতির অনেক কথা চণ্ডীদাসের গ্রন্থে পাওয়া যায়।

আবার অন্য দিকে কাব্য ও লৌকিক উপাখ্যান হইতেও চণ্ডীদাস যথেষ্ট মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গীতগোবিন্দের অনেকগুলি গানকে ত তিনি সুন্দর অনুবাদ করিয়া

---

* ১৮ই চৈত্র, ১৩৩৪ তারিখে পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

নিজ গ্রন্থে চালাইয়া দিয়াছেন। আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই যে, বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্ম্ম-পূজাবিধান গ্রন্থে যেখানে যেখানে কৃষ্ণের কথা আছে, তাহা চণ্ডীদাসের অনেক কথার সঙ্গে মিলিয়া যায়। মোটামুটি বলিতে গেলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদ্ভবের আগে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবতা কি আকার ও স্বরূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহা আমরা এই গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এমন সব কথা আছে, যাহা পরবর্ত্তী বৈষ্ণবেরা একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের গ্রন্থে কোথাও ইহার নাম পাওয়া যায় নাই। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় ইহার নাম দিয়াছেন "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন"। এই নাম লইয়া একটু গণ্ডগোল আছে। কীর্ত্তন শব্দ দ্বারা আমরা পদাবলীসাহিত্য বুঝিয়া থাকি। কিন্তু চণ্ডীদাসের এই গ্রন্থ গান হইলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রানুমোদিত কীর্ত্তন নহে। সুতরাং মনে হয়, নামের জন্য এ গ্রন্থ আলোচনায় অসুবিধাও কম হয় নাই। এই গ্রন্থ সংস্কৃত ও লৌকিক পুরাণের সমবায়ে গঠিত বলিয়া ইহাও পুরাণ আখ্যা পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। বাস্তবিক বঙ্গভাষায় কৃষ্ণলীলাবিষয়ক যদি কোন মৌলিক পুরাণ থাকে, তবে তাহা এই কৃষ্ণকীর্ত্তন। ইহার অনেকগুলি খণ্ড ছিল, সবগুলির উদ্ধার না হওয়াতে এই গ্রন্থের পরিচয় অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। ইহার রচনা দেখিয়া মনে হয়, ইহার মথুরাখণ্ডে কংসবিনাশের কথাও ছিল। যাহা হউক, ইহাকে পুরাণ বলিলে ইহার ঠিক প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। তুলনা হিসাবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গলার মঙ্গল কাব্যগুলি আমাদের লৌকিক পুরাণ, যথা - ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ইত্যাদি। কৃষ্ণকীর্ত্তন এই ধরণের উচ্চশ্রেণীর মিশ্র পুরাণ।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত একটি বিষয় এই যে, কৃষ্ণ ও বিষ্ণুকে এমন ভাবে জড়ান হইয়াছে যে, দুই জনকে পৃথক্ করা যায় না। এই জন্য স্থানে স্থানে সংস্কৃত ও লৌকিক পুরাণের বিষয়বস্তুর মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা যায়। এই কথাটি মনে রাখিলে চণ্ডীদাসের গ্রন্থ যে যুগে লিখিত হইয়াছিল, তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইহা বৈষ্ণব-সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব মিশ্রণের ফল।

কৃষ্ণকীর্ত্তন ঠিক রকম বুঝিতে হইলে ইহার আলোচনাপদ্ধতির দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তনকে বিশ্লেষণ করিয়া (analysis) ইহার উপাদানগুলির বিশিষ্টতা কি, ধরিতে চেষ্টা করা দরকার, তারপর অনুরূপ সাহিত্যের মালমশলার সহিত ইহার উপাদানগুলির সংশ্লেষণ (synthesis) না করিলে ইহার স্থান ও মৌলিকতা বুঝিতে পারা যাইবে না।

এই জন্য আমি কৃষ্ণকীর্ত্তনের এই আলোচনা তিন ভাগে বিভক্ত করিতে চাই।

প্রথম ভাগে ইহার বিশিষ্ট উপকরণ সম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে। কৃষ্ণ এবং রাধা সম্বন্ধে কোন্ কোন্ কথা কোন্ কোন্ মূল গ্রন্থ বা স্তরবিভাগের মধ্য দিয়া আসিয়াছে, তাহা এই ভাগে আলোচিত হইবে। অদ্যকার প্রবন্ধে শুধু কৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল।

দ্বিতীয় বিভাগে গীতিনাট্য হিসাবে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ আলোচিত হইবে। আমার মনে হয়, এ দিকে লক্ষ্য না দেওয়ায় আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনের মর্য্যাদা মোটেই রক্ষা করি নাই। বাঙ্গলা দেশের সঙ্গীতের ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থ অমূল্য।

তৃতীয় বিভাগে ভারতীয় কৃষ্ণ-সাহিত্যে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিবার চেষ্টা করা যাইবে। সংস্কৃতে ও দেশীভাষায় প্রবল কৃষ্ণ-সাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে চণ্ডীদাসের একটি নিজস্ব মহিমা আছে, তাহা দেখাইতে পারিলে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

এবার অন্তকার বিষয় লইয়া উপস্থিত হইতেছি।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের উপাদান

কৃষ্ণের নানা নাম

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণের নানা নাম পাওয়া যায়, ইহাদের সকলের সঙ্গে কৃষ্ণলীলার কোন সম্পর্ক নাই। বিষ্ণুর নানা অবতার ও নাম কৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছে। কৃষ্ণকে যদি গোপীনাথ, গোবিন্দ, গোপাল, নন্দের নন্দন, বসুলকুমার, বালগোপাল প্রভৃতি বলা হয়, তবে তাহাতে স্বাভাবিক চিন্তার কোন বাধা হয় না, কিন্তু তাঁহাকে যদি পদ্মনাভ, চক্রপাণি, গদাধর, সারঙ্গধর, মধুসূদন, মুরারি, নরসিংহ, হৃষীকেশ, গরুড়বাহন বলা যায়, তবে বুঝিতে হইবে, কবি ইহা চাহেন যে, আমরা কৃষ্ণের উপস্থিত ললিতলীলার মধ্য দিয়াও বিষ্ণু-দেবতার শৌর্য্য ও বীর্য্যপ্রকাশক কার্য্যাবলীর যোগ রক্ষা করি। এই নামগুলির মধ্যে স্মরঙ্গধর শব্দটির অর্থ আমরা পরে আলোচনা করিয়াছি।

এই নামগুলি ছাড়া আর যে সব নাম কৃষ্ণকে দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রীধর, শ্রীনিবাস, দেহের দেবতা, মদনমুরুতী ও মাহাকোল শব্দগুলি লক্ষ্য করা দরকার।

শ্রীধর শব্দদ্বারা কৃষ্ণের সঙ্গে লক্ষ্মীর সম্বন্ধ অতি পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। প্রাচীন পুরাণে ও কৃষ্ণকীর্ত্তনে লক্ষ্মী আসিয়া রাধা হইয়াছেন, এরূপ আছে; কিন্তু পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যে রাধাকে লক্ষ্মী হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলা হইয়াছে। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ তাঁহার রাধাকে বলিতেছেন,—আপণ অঙ্গের লখিমী হইআঁ।—পৃঃ ১২৯। এই শ্রীধর শব্দ বিষ্ণুপুরাণেও (১.৮.২৩) অনুরূপভাবে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণের (১৮.১৫) "বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী" কথার এবং ভাগবতের "গাত্রলক্ষ্মী" কথার ধ্বনি চণ্ডীদাসে পাওয়া যায়,—

শ্রীধররূপেঁ হরিআঁ নিবোঁ তোরে।—পৃঃ ১২৭

কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণকে 'দেহের দেবতা' ও 'দেহার দেব' বলা হইয়াছে।—দেহের দেবতা তোক্ষে জগতের নাথ।—পৃঃ ১০৫। দেহার দেব…(পৃঃ ১৩২)। এ বিষয়ে পরে আরও আলোচনা হইলে এ ধারণার মূল কোথায়, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

মদনমুরুতী শব্দের তাৎপর্য্য ও মূল পরে আলোচিত হইয়াছে।

বিষ্ণুর বরাহ অবতার বুঝাইতে মাহাকোল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।—মাহাকোল-রূপেঁ দন্তে মেদিনী উঠায়িলোঁ।—পৃঃ ২৩৫। সংস্কৃত অভিধানে বরাহ অর্থে কোল শব্দ পাওয়া যায়; প্রাচীন পুরাণেও বরাহ অবতারকে মহাকোল বলা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, চণ্ডীদাস ছাড়া আর কোন কবি এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কি না, সন্দেহ।

অবতার

বিষ্ণুর নানা অবতার পৌরাণিক সাহিত্যের একটি বিশেষ আলোচনার বিষয়। বৈদিক বিষ্ণু হইতে পৌরাণিক অবতারগুলির ধারণা কি করিয়া আসিয়াছে, তাহার আলোচনা অনেকেই করিয়াছেন। প্রাচীন ও মধ্যকালের মূল সংস্কৃত গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে নানা তথ্য ছড়াইয়া আছে। সৃষ্টিরক্ষার কাজে বিষ্ণুকে বারে বারে ভূভার হরণের জন্য অবতরণ করিতে হইয়াছে। অবতারের বার সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। কেহ বলিয়াছেন, বিষ্ণুর অবতার ২৪টি, কেহ ২২টি। শেষকালে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর কাছাকাছি বিষ্ণুর দশটি অবতার মাত্র সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন দেখা যায়।

চণ্ডীদাস বিষ্ণুর অবতার কিরূপভাবে ধরিয়াছেন, আমরা এবার তাহা দেখিব। কৃষ্ণকীর্ত্তনের ১০১-২ পৃষ্ঠায় আছে,—মুরারী [মীন], রাম, বরাহ এবং নরসিংহ; ১২৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়—বামন, মীন, শ্রীধর [অর্থাৎ কৃষ্ণ], বরাহ এবং শ্রীরাম। আর ২৩৫ পৃষ্ঠায় দশটি অবতারের নাম এইরূপ আছে,—মীন, কচ্ছপ, বরাহ, নরহরি, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী। এখানে 'শ্রীধর' শব্দ দ্বারা এবং "এবেঁ উপজিলা কংস বধের কারণ" হইতে কৃষ্ণকেও বিষ্ণুর অবতার হিসাবে ধরা হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি হইতেও বুঝা যায় যে, কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার মনে করাটা খুবই চলিত ছিল।

(১) সকল দেবের [illegible]বোলেঁ হরি বনমালী।
আবতার করি করে ধরণীত কেলী॥—পৃঃ ৬

(২) তোহ্মার কারণে আহ্মে আবতার কৈল।—পৃঃ ১০৩

(৩) আহ্মে হরী নারায়ণ মুকুন্দ মুরালী ল
যুগেঁ যুগে অবতার করী ল—পৃঃ ৩৬১

তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে "ধর্ম্মপূজাবিধানে" আমরা দেখিতে পাই,—

সপ্তম মুরুতে গোশাঞি বলালে গোপি কান্ [—কৃষ্ণ]।
বিপ্রকুলে জন্মিঞা গোয়ালাকুলে নাম॥—পৃঃ ২১৪

কৃষ্ণ যে বিষ্ণুর একজন অবতার, এ কথা বহু প্রাচীন গ্রন্থেও আছে। যথা—হরিবংশ

(১.৪২), মহাভারত (শান্তিপর্ব্ব), মৎস্যপুরাণ (২৫৮.১০) ইত্যাদি। ভাগবতেও দুই জায়গায় এইরূপ কথা পাওয়া যায়,—

(১) রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরং।—১.৩.২৩.

(২) কৃষ্ণাবতারঃ... ... .. ।—১০.৩.৯.

এই কথা বলিয়াও ভাগবত পরে বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারের উপরে কৃষ্ণের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (১.৩.২৮) এই ধারণার মূলে মধ্যযুগের নব-বৈষ্ণব ধর্ম্ম অনেকটা কাজ করিয়াছিল। এই নবপ্রস্থানের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কৃষ্ণ সুধু সকল দেবতার নয়, এমন কি, বিষ্ণুর উপরেও স্থান পাইলেন, সেই জন্য আর আগের মত দশ অবতারের মধ্যে কৃষ্ণের নাম আসা অসম্ভব হইল। গীতগোবিন্দ (১.৫—১৬) ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তে তাই অবতারের মধ্য কৃষ্ণের নাম নাই।

এ বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা ভাগবত, গীতগোবিন্দ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের কথা মানিয়া, কৃষ্ণকে অবতার না ধরিয়া অবতারী করিয়া তুলিয়াছেন। চণ্ডীদাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়ায় তিনি প্রাচীন গ্রন্থের অনুসারে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার মান্য করিয়াছেন। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে দশ অবতারের মধ্যে বলরামও আছেন, কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে বলরাম অবতার নহেন।

বয়স

বৈষ্ণবদের কারবার কিশোর কৃষ্ণকে লইয়া, তাই তাঁহারা "বয়ঃ কৈশোরকমে"র গুণ গাহিয়াছেন। এখানে আমরা কৃষ্ণ ও রাধার বয়সের তুলনা করিতে চাই; কারণ, নানা গ্রন্থে এই বয়স নানা ভাবে বলা হইয়াছে।

পুরাণমধ্যে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধার নাম পাওয়া যায়, ইহার কৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১৫শ অধ্যায়ে কৃষ্ণকে 'বালঃ' ও 'মায়াবালকবিগ্রহঃ' বলা হইয়াছে; আরও পাওয়া যায় যে, এই বালক কৃষ্ণকে বয়স্কা রাধা কোলে করিয়াছিলেন—তার পর অবশ্য কৃষ্ণ হঠাৎ কিশোর হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাধার বয়স্কা হওয়ার কারণ, তিনি শ্রীদামের শাপের জন্য আগেই পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম লইয়াছিলেন। সুতরাং যখন কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, তখন রাধা বেশ বড়ই ছিলেন।

জয়দেব এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত অনুসরণ করিয়া গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে রাধাকে কৃষ্ণ অপেক্ষা বড় করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরে আর কোনই উল্লেখ নাই।

কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে এ সব কিছুই নাই, বরং কৃষ্ণ কিছু বড় হইয়া গোচারণ আরম্ভ করিলে পর রাধার জন্ম হয়।

(১) নিতি নিতি বাছা রাখে গিআঁ বৃন্দাবনে।—পৃঃ ৬

(২) লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে॥ আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।—পৃঃ ৬

ভাগবতে (১০.১৫.১) পাওয়া যায়, কৃষ্ণ পৌগণ্ড বয়সে অর্থাৎ ছয় বৎসর হইতে গোচারণ করিয়াছিলেন, টীকায় সনাতন গোস্বামীও এ কথা বলিয়াছেন। আবার কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণ নিজের বয়সের কথা রাধাকে এইরূপ বলিতেছেন,—বএসেঁ জ্যেষ্ঠ—পৃঃ ৪০। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মত চণ্ডীদাস অলৌকিকতা দেখাইতে যাইয়া অস্বাভাবিকতা আনিয়া ফেলেন নাই।

শরীরের বর্ণ

কৃষ্ণের শরীরের বর্ণ নানা গ্রন্থে কোথাও 'কৃষ্ণ', কোথাও 'শ্যাম' এবং কোথাও 'নীল' শব্দ দ্বারা সূচিত হইয়াছে। নীলবর্ণ বুঝাইতে ভাগবতে (১০.২৩.১৬ অথবা ২২) শ্যাম শব্দ পাওয়া যায়। কৃষ্ণের বর্ণের দিকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত গ্রন্থে (১০.২৬.১৬) "ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" অতি পরিস্কার ভাবে বলা হইয়াছে। তুলনা করিতে যাইয়া পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে দুই জায়গায় কৃষ্ণকে 'ইন্দীবরদলশ্যামঃ' (২৩৫ ৪৪) ও 'ইন্দ্রনীলমণিশ্যামঃ' (২৩৯।১১) রূপে পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দে 'শ্যামসরোজ' (১১.১১.) ও "নীলনলিনম্" (১১.২৬), অথবা একেবারে 'নীলকলেবর'ই আছে।

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা পাই 'কাল' (পৃঃ ৩৮, ৮০, ২৯৫ ইত্যাদি), এবং 'নীল' (পৃঃ ৩০২)। চণ্ডীদাসের নামীয় প্রাচীন পদাবলীতে কৃষ্ণের তুলনা দিতে অতসী ফুলের নাম পাওয়া যায়। অতসী কুসুম সম শ্যাম সুনায়র।—চণ্ডীদাস (নীলরতন) পৃঃ ৩১৬। প্রাচীন কালে অতসী ফুল যে নীলবর্ণের হইত, তাহা চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতেই জানা যায়,—

(১) নীল অতসীর ফুল তাহে ছিল।—চণ্ডীদাস (নীলরতন) পৃঃ ৫২।

(২) অতসীর ফুল তুলি মনোহর
যতন করিয়া পরি।—ঐ পৃঃ ২৫০.

প্রাচীন ভারতীয় উদ্ভিদ্বিদ্যাতেও অতসীকে পরিষ্কার ভাবে 'নীলপুষ্প' বলা হইয়াছে। তার পর, নানা গ্রন্থেও অতসী ফুলের নীলবর্ণের কথা আছে—

(১) অতসীকুসুমশ্যামঃ।—বৃহৎসংহিতা – ৫৮.৩২.

(২) অতসীপুষ্পসঙ্কাশং—পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ৭৩.২.২১২,৩৬; বৃহন্নারদীয়পুরাণ ১৫।৬৮, ৩৬।৪০; এমন কি, ধর্ম্মপূজাবিধানেও আছে—অতসীপুষ্পসঙ্কাশং।—পৃঃ ৫৪।

এই নীলবর্ণ অতসী পরবর্ত্তী বাঙ্গলা সাহিত্যে পীতবর্ণরূপে গণ্য হইয়াছে। এখন আমরা যে অতসীর কথা জানি, তাহা পীতবর্ণ। রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন, তিন শত বৎসর হইতে অতসীর সাহিত্যিক বর্ণ-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তিনি কবিকঙ্কণচণ্ডীর নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে দেখাইয়াছেন, অতসী তখন পীতবর্ণরূপে গণ্য হইয়াছে—অতসীকুসুম বর্ণ।—কবিকঙ্কণচণ্ডী (বঙ্গবাসী সং) পৃঃ ৫৮।

আমার মনে হয়, অতসী নীল ও পীত, দুই রকমেরই ছিল। পূর্ব্বে শুধু নীল অতসীর কথাই বেশী ব্যবহৃত হইত। কৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা 'বন সোনাকড়ী' পাই (পৃঃ ২০৭), ইহার অর্থ বন্য অতসী। ইহার নাম হইতে মনে হয়, ইহা পীতবর্ণের ছিল। ইহা বন্য বলিয়াই হয় ত পূর্ব্বে বেশী আদৃত হইত না। তারপর কৃত্তিবাসে পাওয়া যায়,—

অতসী অপরাজিতা যাতে দুর্গা হরষিতা।—রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড। এখানে অতসী নীলও হইতে পারে, পীতও হইতে পারে।

চণ্ডীদাসের পর আর কোনও কবি কৃষ্ণকে অতসী ফুলের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন কি না, আমি জানি না। যদি না করিয়া থাকেন, তবে ইহা চণ্ডীদাসের প্রাচীনতার একটি পরিচয় মনে করা যাইতে পারে।

ভঙ্গি

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, বিষ্ণুর মূর্ত্তি সমপদস্থানক ভঙ্গিতে অর্থাৎ সোজাসুজি দাঁড়ান, অথবা গরুড়ের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় থাকে। বিষ্ণুর অবতারদেরও কোন বিশিষ্ট ভঙ্গির উল্লেখ নাই। কৃষ্ণের নানা রকমের লীলার মধ্যে বংশীবাদনকে একটু বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাই অন্যান্য লীলার কোন ভঙ্গির উল্লেখ না থাকিলেও বংশীবাদনের বেলায় ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমার আমদানি করা হইয়াছে। ভাগবতে ও গীতগোবিন্দে বংশীবাদনের সময়ে চক্ষু ও ঠোঁটের অবস্থার কথা পাওয়া যায়, কিন্তু শরীরের কোন ভঙ্গির উল্লেখ নাই। চণ্ডীদাস এ ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছেন,তাই তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তনে ত্রিভঙ্গের কথা পাওয়া যায় না।

পরবর্ত্তী পদাবলীকারদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের পার্থক্য এখানেও দেখা যায়। তাঁহাদের ত ত্রিভঙ্গ ছাড়া কথাই নাই। এমন কি, চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীতেও ত্রিভঙ্গ পাওয়া যায়,—

ত্রিভঙ্গ হইয়া রও বাঁশী সনে কথা কও...।—(নীলরতন সং—পৃঃ ২০৮)। ধর্ম্মপূজা-বিধানেও এই ত্রিভঙ্গের উল্লেখ আছে,—

মূলে কল্পতরোস্ত্রিভঙ্গললিতং ধ্যায়েজ্জগন্মোহনম্।—(পৃঃ ৫৬.)

কৃষ্ণের এই ত্রিভঙ্গ, যাহা আমরা প্রাচীন কোন গ্রন্থে পাই না, কোথা হইতে আসিল, এ বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক। আমার আপাততঃ মনে হয়, ইহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর তান্ত্রিকতার প্রভাব হইতে হইয়াছে।

হাত

বিষ্ণুর নিজ কাজ উদ্ধারের জন্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণের কথা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু কৃষ্ণের কাজ ত প্রায় বাঁশী বাজানোতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাই তাঁহার দুইখানা

হাতের চেয়ে বেশী দরকার হওয়ার কথা নয়। কিন্তু প্রাচীন কালে যখন কৃষ্ণের হাতে আয়ুধ দিতে বৈষ্ণবদের কোন দ্বিধা হইত না, তখন তাঁহার চারিখানা হাতের কথাই পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণের এই শ্লোকটি আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা বড় সহজ নয়,—

কৃষ্ণাবতারে তু গদা বামহস্তে প্রশস্যতে।
যথেচ্ছয়া শঙ্খচক্রে চোপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ ॥—২৫৮.১০.

অগ্নিপুরাণ ও পদ্মপুরাণেও এই কথার অনুমোদন আছে।

ভাগবত নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৃষ্ণের অবতারের উপযুক্ততাকে খর্ব্ব করিয়াছে। তাই প্রথম চারি হাত স্বীকার করিয়া লইয়া লীলাপুষ্টির জন্য সুধু দুই হাত বজায় রাখা হইয়াছে। ভাগবতে আছে (১০.৩), বিষ্ণু যখন কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার চারি হাত ও উহাতে চারিটি আয়ুধ ছিল, কিন্তু দেবকীর অনুরোধে কৃষ্ণ-অবতারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলিয়া দুই হাত ও অস্ত্রগুলি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল।

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণের চারিটি আয়ুধের কথাও যেমন আছে, তাঁহার বাঁশী ও লগুড়ের কথাও তেমনি আছে, অথচ হাতের সংখ্যা দেওয়া নাই। আমার মনে হয়, চণ্ডীদাস এ বিষয়ে প্রাচীন পুরাণ ও ভাগবত, দুইয়েরই অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া পরিষ্কার কিছু বলেন নাই।

আয়ুধ

বিষ্ণু ভূভার হরণের জন্য অর্থাৎ দৈত্য-দানব বধের জন্য অবতীর্ণ হন বলিয়া তাঁহাকে আয়ুধ গ্রহণ করিতে হয়। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন অনুসারে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার, তাই অন্যান্য অবতারের ন্যায় কৃষ্ণকেও আয়ুধ বহন করিতে দেখা যায়। কৃষ্ণের সম্পর্কে আমরা বাঁশীর কথাই মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি, সুতরাং চণ্ডীদাসের এই আয়ুধ-আয়োজন দেখিয়া আমরা অনেকেই হয় ত হতাশ হইব। যাহা হউক, তিনি বহু জায়গায় চারিটি আয়ুধেরই নাম করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলায় আয়ুধ ব্যবহারের স্থান নাই বলিয়া এগুলি খাপছাড়া হইয়াছে।

(১) যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে।
সেহি শঙ্খচক্র গদা শারঙ্গ ধরে ॥—পৃঃ ৪

(২) শঙ্খচক্র আঙ্কে গদা শারঙ্গ ধরী।—পৃঃ ৮৫

(৩) আঙ্কে দেব শারঙ্গধরে।—পৃঃ ২৮৮

এখানে শারঙ্গ শব্দের আলোচনা আবশ্যক। কৃষ্ণের হাতের আর তিনটি জিনিস সামরিক আয়ুধ, সুতরাং শারঙ্গও সেরূপ কিছু হইবে, এ কথা সহজেই মনে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের চলিত ধারণা অনুসারে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম, এক সঙ্গেই মনে আসিয়া পড়ে। সেই জন্য শারঙ্গ অর্থে পদ্ম ধরিয়া লওয়া খুবই স্বাভাবিক। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদক

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় অনেকার্থকোষ এবং বিদ্যাপতির "সারঙ্গ উপর উগল দশ সারঙ্গ" কথা হইতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের শারঙ্গ অর্থে পদ্ম ধরিয়াছেন। এ ধারণায় ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি সাহায্য করিয়াছে,—

শঙ্খশক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্। - ১০.৩২৬

হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডেও বিষ্ণুর হাতে 'পঙ্কেরুহ' বা পদ্ম দেখা যায়। আমাদের ধর্ম্মপূজাবিধানেও আছে,—

শঙ্খং রথাঙ্গং গদামম্ভোজং দধতং...(পৃঃ ৫৪)

চণ্ডীদাস শারঙ্গ শব্দ দ্বারা খুব সম্ভবতঃ পদ্ম মনে না করিয়া ধন্বাস্ত্রই মনে করিয়াছেন। ভাগবতেও আমরা পাই, কৃষ্ণের হাতের সব কয়েকটিই আয়ুধ ছিল, পদ্মফুল ছিল না—

চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।— ১০.৩৮.

কৃষ্ণের এই শারঙ্গ বা শার্ঙ্গ কিরূপ অস্ত্র, তাহাও জানা গিয়াছে। বৃহৎগৌতমীয় তন্ত্রে অতি পরিষ্কারভাবে শার্ঙ্গধনুর কথা উল্লিখিত আছে,—

দক্ষস্যোর্দ্ধে স্মরেচ্চক্রং গদাঞ্চ তদধঃকরে।
বামস্যোর্দ্ধে শার্ঙ্গধনুঃ শঙ্খঞ্চ তদধঃ স্মরেৎ ॥

সুপ্রসিদ্ধ সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবতোষিণী টীকায় যেন প্রচলিত পদ্ম স্থানে শার্ঙ্গ দেখিয়া খুসী হইতে পারেন নাই, তাই লিখিয়াছেন,---"কিন্তু শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজং ইতি বক্ষ্যমাণানুসারেন শার্ঙ্গস্থানে পদ্মং জ্ঞেয়ং। তত্র তু শার্ঙ্গোপদেশাপসনা বিশেষার্থমেব। ভগবতি তু সর্ব্বদা সর্ব্বসমাবেশাৎ নাসম্ভবমিতি।" আমরা অন্যান্য গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি, প্রাচীন কালে বিষ্ণুর হাতে পদ্ম ছিল না। কোন কোন বিষ্ণু-মূর্ত্তিতেও পদ্ম থাকে না, তার বদলে শার্ঙ্গধনু থাকে, তাহাদের মূর্ত্তিতত্ত্বানুযায়ী নাম—ত্রৈলোক্যমোহন, হরিশঙ্করক।* আমার মনে হয়, চণ্ডীদাসও প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী ধনু অর্থে শারঙ্গ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

বাঁশী

কৃষ্ণের কথা বলিতে গেলেই তাঁহার বাঁশীর কথা আসে। মধ্যযুগের বৈষ্ণবেরা যেমন রাধাকে ঠিক সৃষ্টি করিয়া না থাকিলেও তাঁহার লীলা ও মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন, বাঁশীও সেইরূপ তাঁহাদেরই দান। কৃষ্ণলীলার পুষ্টির জন্য বাঁশী খুব আবশ্যক মনে অবরহইয়াছিল, তাই বিষ্ণুতারদের হাতে যুদ্ধোপযোগী আয়ুধ থাকিলেও কৃষ্ণের হাতের আয়ুধগুলিকে শুধু মাত্র দুই একবার উল্লেখ করিয়া তাঁহার লীলার জন্য বাঁশীই প্রাধান্য পাইয়াছে। বাস্তবিক ব্রজব্যাপারে বাঁশী ছাড়া অন্য কিছুর সামঞ্জস্যও ত হয় না।

---

* বিষ্ণুমূর্ত্তিপরিচয়—পৃঃ ২৩-২৪।

চণ্ডীদাস বাঁশীকে কিরূপভাবে দেখাইয়াছেন, তাহা বুঝিবার আগে বৈষ্ণব-সাহিত্যে বাঁশীর ইতিহাস আলোচনা করা দরকার।

প্রথমেই আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই যে, বিষ্ণুপুরাণে বাঁশীর নামগন্ধই নাই। এমন কি, রাসলীলার সময়েও বাঁশী দরকার হয় নাই।

(১) জগৌ কলপদং শৌরির্নানাতন্ত্রী-কৃত-ব্রতম্।—৫.১৩.১৬

(২) রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণঃ।—৫.১৩.৫৫

এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কৃষ্ণ মুখে রাস-উৎসবের উপযোগী পদ গান করিয়াছিলেন, তার সঙ্গে নানা তারের যন্ত্র বাজান হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে এই গ্রন্থের 'কলপদং' পদ হইতে নানা কথা আসিয়া পড়িয়াছে।

ভাগবতেই প্রথম বেণুর কথা পাওয়া যায়। ইহা বাঁশীর প্রকার-ভেদ, তাহা পরে দেখা যাইবে। ভাগবতের কথাগুলি এইরূপ,—

(১) চুকূজ বেণুম্।——১০.২১.২

(২) কলবেণুগীতম্।——১০.২১.১৪

(৩) জগৌ কলম্।———১০.২৯.৩

এই বেণু কি, বুঝাইতে যাইয়া ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবতোষিণী গ্রন্থে এইরূপ বলিয়াছেন,—

বংশ্যা অপি বৈশিষ্ট্যমস্তি। যথোক্তং।—

অর্দ্ধাঙ্গুলান্তরোম্মানং তারাদিবিবরাষ্টকং।
ততোঽঙ্গুলান্তরে যত্র মুখরন্ধ্রং তথাঙ্গুলং॥
শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ত্র্যঙ্গুলং সা তু বংশিকা।
নবরন্ধ্রা স্মৃতা সপ্তদশাঙ্গুলমিতা বুধৈঃ॥
দশাঙ্গুলান্তরা স্যাচ্চেৎ সা তারমুখরন্ধ্রয়োঃ।
মহানন্দেতি বিখ্যাতা তথা সম্মোহিনীতি চ॥
ভবেৎ সূর্য্যান্তরা সা চেৎ তত আকর্ষণী মতা।
আনন্দিনী তদা বংশী ভবেদিন্দ্রান্তরা যদি॥
গোপানাং বল্লভা সেয়ং বংশুলীতি চ বিশ্রুতা।
ক্রমান্মণিময়ী হৈমী বৈণবীতি ত্রিধা চ সা॥ ইতি

ইহা হইতে জানা যাইতেছে, বাঁশী তিন প্রকারের হইত—মণি, স্বর্ণ ও বেণু দ্বারা নির্ম্মিত। ভাগবতে কিন্তু বেণুই বলা হইয়াছে।

তারপর বাঁশীর গানের কথা। ভাগবতে 'কলবেণুগীতম্' আছে, এবং তাহাকে 'গীতম্ অনঙ্গবর্দ্ধনম্' এই অবধি মাত্র বলা আছে। তাহা হইতে পরবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যেরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয়, তাঁহারা সাম্প্র-

দায়িক সিদ্ধান্ত অনুসারেই ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কলম্ শব্দটির ধ্বনির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী উহার এইরূপ শ্লিষ্টার্থ করিয়াছেন,—'অত্র শ্লেষেণ কামবীজং জগাবিতি রহস্যং। যতো বামদৃক্‌সম্বন্ধি হস্তং সহিতং কলামতি প্রথমাক্ষরত্রয়ং ব্যঞ্জিতং।' (বৈষ্ণবতোষিণী)। অর্থাৎ কলম্ বলিতে ক, ল ও ম্ আছে, ইহারা হইতেছে বৈষ্ণবদের কামবীজ বা মহামন্মথমন্ত্র অর্থাৎ ক্লীং ধ্বনির প্রথম তিনটি অক্ষর। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয়, যদিও ভাগবতকার অনঙ্গবর্দ্ধন গীতের কথা বলিয়াছেন (এবং রাসলীলায় উহা খুবই স্বাভাবিক), তথাপি তিনি গোস্বামিপাদের এই ব্যাখ্যা মানিতে পারিতেন কি না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার উপর যে তান্ত্রিকতার প্রভাব পড়িয়াছিল, ইহা তাহার ফল বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

গীতগোবিন্দে দেখিতে পাওয়া যায়, কবি জয়দেব কৃষ্ণের বাঁশীকে কাব্যের মাধুরী বাড়াইবার কাজে লাগাইয়াছেন।

(১) কলস্বনবংশে।—১. ৪৫.

(২) নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।—৫. ৯

এখানে বাঁশীতে রাধার নাম ধরিয়া ডাকিবার ও তাঁহাকে সঙ্কেতস্থানে মিলিত হইবার ইঙ্গিতের কথা পাওয়া যাইতেছে। নায়ক ও অভিসারিকা নায়িকার সঙ্কেতস্থলে মিলিত হইবার বহু রকমের ইঙ্গিত সংস্কৃত-সাহিত্যে পাওয়া যায়, যেমন লীলাকমল দেখান। এই বাঁশীর সঙ্কেতও একটি। এখানে একটি কথা একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলা যাইতে পারে যে, জয়দেব সাধারণতঃ প্রাচীন পুরাণ অপেক্ষা অলঙ্কারশাস্ত্রেরই বেশী অনুগামী হইয়াছেন।

চণ্ডীদাস বাঁশীর কথা কি বলেন, এবার তাহা দেখিবার সময় আসিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে আমরা বুঝিতে পারি, তিনি এ বিষয়ে প্রাচীন পুরাণ ও লৌকিক কল্পনার সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু দুই দিক্ রক্ষা করিতে গিয়া বিভ্রাটও ঘটাইয়াছেন। প্রথম আমরা দেখিতে পাই, কৃষ্ণ গোচারণের আদি হইতেই বাঁশী বাজান আরম্ভ করিয়াছিলেন,—

(১) পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে।—পৃঃ ৬.

(২) কদম তলাত   বসিআঁ কাহ্নাঞি
নাকে মুখে বাঁশী বাএ।—পৃঃ ৮০.

কিন্তু যখন রাধাকে ভুলাইবার জন্য কৃষ্ণ চেষ্টিত হইলেন, তখন আগে অন্যান্য যন্ত্র বাজাইয়া তাহাতে কাজ না হওয়ায় বাঁশীর সৃষ্টি করা হইল, এইরূপ কথা কৃষ্ণকীর্ত্তনের শেষের দিকে পাওয়া যায়,—

(১) খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ।—পৃঃ ২৯৩.

(২) আর যত বাদ্যগণ আছের কাহ্নাঞিঁ।
পতি দিনে নানা ছন্দে বাএ সেই ঠাঁই॥—পৃঃ ২৯৩.

এ কথা মোটামুটি বিষ্ণুপুরাণের সঙ্গে মিলে। কেবল বাঙ্গলাদেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার জন্য তারযন্ত্রের বদলে খোল করতাল দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এই সব যন্ত্রের পর আসিল বাঁশী—সেই জন্য বংশীখণ্ড নামে একটি নূতন পালার উদ্ভব হইল,—

তা দেখিআঁ না ভুলিলী আইহনের রাণী।
স্থজি কাহ্নাঞি তবে মোহন বাঁশী॥
সাত গুটি বিন্ধ তাত করি আনুপাম।—পৃঃ ২৯৩.

মোহনের কাজের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ইহা মোহন-বাঁশী নামে পরিচিত, ইহাকেই সনাতন গোস্বামী সম্মোহিনী বলিয়াছেন।

কৃষ্ণের এই বাঁশী কিরূপ ছিল, তাহাও কৃষ্ণকীর্ত্তনে দুই রকমের পাওয়া যায়। এক হইতেছে, ইহা মণি ও স্বর্ণের নির্ম্মিত ছিল,—

(১) সুদ্ধ সুবর্ণের মোহোর বাঁশী।—পৃঃ ২৪২.
(২) সুবর্ণের সাম্বী হিরার বান্ধিল কাম।—পৃঃ ২৯৩.

আবার পাওয়া যায়, ইহা আড়বাঁশী (পৃঃ ৩০৬) ছিল। আড়বাঁশী বাএ মধুরে।—পৃঃ ৩৩৪*। ধর্ম্মপূজাবিধানে আমরা পাই—কলবেণুবাদনপরং (পৃঃ ৫৩), আড়বাঁশী ত বেণু বা বাঁশেরই হইয়া থাকে। বাঙ্গলাদেশে আড়বাঁশীই বেশী প্রচলিত, সুতরাং চণ্ডীদাস বোধ হয়, বাঁশের বাঁশীই এ স্থলে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, তিনি সনাতন গোস্বামীর উল্লিখিত তিন রকমের বাঁশীর কোনটাকেই বাদ না দিয়া সবগুলিকে একত্র মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তারপর, বাঁশীর ধ্বনি সম্বন্ধে চণ্ডীদাস এমন একটা কথা বলিয়াছেন, যাহা বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, গীতগোবিন্দ অথবা পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না। তিনি বলিয়াছেন, কৃষ্ণের বাঁশীতে ওঙ্কার ধ্বনিত হইত ও চারি বেদ গীত হইত।

(১) হরিষে পুরিআঁ কাহ্নাঞি তাহাত ওঁকার।—পৃঃ ২৯৩
(২) ঋগ যজু সাম আথর্ব্ব
চারী বেদ গাওঁ মোঁ বাঁশীর সরে।—পৃঃ ৩২৩

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত একটি পদেও পাওয়া যায়,—

রন্ধ্রে রন্ধ্রে ওরা ধ্বনি···।—চণ্ডীদাস (নীলরতন সং)—পৃঃ ২০৯.

আমার মনে হয়, ইহা ওঙ্কারধ্বনি, এইরূপ হইবে।

চণ্ডীদাস নানা জায়গা হইতে তাঁহার গীতিনাট্যের মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া

---

* কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদের এই অংশের সহিত নীলরতনবাবুর সংগৃহীত অনুরূপ পদের "আর বায় বাঁশী সুমধুরে" তুলনা করিয়া স্পষ্টই ধরা যায় যে, পরবর্ত্তী কথাগুলিই পূর্ব্ববর্ত্তীর বিকৃত রূপ মাত্র।

তাঁহার গ্রন্থে নানা রকমের কথা আসিয়া জুটিয়াছে। তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, কৃষ্ণই বাঁশীর উদ্ভাবন করেন, আবার এক জায়গায় বলিতেছেন, উহা হরগৌরীর বরে পাওয়া গিয়াছিল। ইহার সামঞ্জস্য বিধান করা সহজ নহে।

বাঁশী পাইল হরগৌরী বরে।—পৃঃ ৩১৪.

কৃষ্ণের বাঁশীর কথা উঠিলেই বাঙ্গালীর কাছে যমুনা উজান বহার কথা মনে হয়। সুতরাং এ বিষয়ে একটু আলোচনা আবশ্যক। ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ২১ ও ২৯ অধ্যায়ে পাওয়া যায়, সমস্ত জীব ও জড়জগৎ কৃষ্ণের বংশীধ্বনি দ্বারা বিচলিত হইত। এমন কি, নদীতেও আবর্ত্ত লক্ষিত হইত,—

নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত-
মাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।—১০. ২১. ১৫.

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ, গীতগোবিন্দ বা কৃষ্ণকীর্ত্তনে কোথাও এরূপ কথা নাই। অথচ অসম্ভব কিছু বুঝাইতে কৃষ্ণকীর্ত্তনে "যদি গাঙ্গ উজান বহে" (পৃঃ ৫৪) পদ পাওয়া গিয়াছে। এ দিকে পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যে যমুনা উজান বহার কথা খুবই পাওয়া যায়, এমন কি, চণ্ডীদাসের নামীয় পদেও আছে,—

রাধাশ্যাম বলি বাজয়ে মুরলী
যমুনা উজান ধরে।—(নীলরতন সং—পৃঃ ২১০).

তান্ত্রিক সাধনায় উজান বহার কথা পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে বৈষ্ণবদের এই ভাবটী এরূপ মিলে যে, মনে হয়, বৈষ্ণবেরা তান্ত্রিক সাধনার এই তত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদেরও এইরূপ ধারণা জানিতে পারা যায়। বৌদ্ধ গানে আছে,—কুল লই খরে সোন্তে উজাঅ—বৌ. গা. দো. পৃঃ ৫৯।

ফুলধনু

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে যে কত প্রাচীন বিষয় লুকাইয়া আছে, তাহা বিশেষ মনোযোগ না দিলে চোখেই পড়ে না। পরবর্ত্তী সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না, এমন সব কথা চণ্ডীদাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তার মধ্যে একটী হইতেছে—চণ্ডীদাস কৃষ্ণকে "মদন মুরুতী" (পৃঃ ৩৫৪) বলিয়াছেন। প্রথম হয় ত এ কথা নিছক কবিত্ব বলিয়া মনে হইবে; কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনেই কৃষ্ণের হাতে মদনের ফুলধনু ও পাঁচবাণ দেওয়া হইয়াছে।

(১) ঝাঁট করী ফুলের ধনুত দেহ গুণ ॥
স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।
উচ্চাটন বাণে লঅ রাধার পরাণে ॥—পৃঃ ২৬৮.

(২) জুড়িআঁ মদন পাঁচ বাণে।—পৃঃ ২৭২.

(৩) সন্ধপেঁ ফুলের ধনু জুড়িল পাঁচ বাণে।—পৃঃ ২৭৪.

(৪) বাম হাথে ধনুক ডাহিণ হাথে বাণ।—পৃঃ ২৮০.

কৃষ্ণকীর্ত্তনের সংস্কৃত শ্লোকেও এই কথা আছে,—

পঞ্চবাণশরৈশ্চক্রে রাধিকামারণে মতিম্ ॥—পৃঃ ২৬৮.

কৃষ্ণের হাতে আয়ুধের মধ্যে আমরা শার্ঙ্গধনু পাইয়াছি, আর এখন পাইতেছি ফুলধনু। ইহা আশ্চর্য্যজনক হইলেও ইহার পৌরাণিক মূল খুঁজিয়া বাহির করা গিয়াছে। বিষ্ণুর একটি রূপের বর্ণনার সঙ্গে উপরের কথাগুলিও মিলিয়া যায়। অগ্নিপুরাণে এই মূর্ত্তির বর্ণনার প্রধান কথাগুলি এই,—(১) সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং প্রাপ্তবয়োলাবণ্যযৌবনং, (২) মদাঘূর্ণিত-তাম্রাক্ষমুদারং স্মরবিহ্বলং, (৩) পঞ্চবাণধরং, ও (৪) ধনু...বিভ্রতং...(৩০৬ অধ্যায়, শ্লোক ১৩-১৭)।

বাহন

বিষ্ণুর নিজের বাহন গরুড়, তাঁহার কোন অবতারের যে আবার বাহন আছে, এ কথা আমাদের জানা নাই। কৃষ্ণের প্রচলিত আখ্যানগুলিতে কোন বাহনের কথা পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাস প্রাচীন পুরাণ অনুসারে কৃষ্ণের হাতে আয়ুধ বজায় রাখিয়াছেন, সুতরাং কাজে না লাগিলেও তিনি গরুড় বাহনের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কালীয়দমনের বেলায় বীরত্ব দেখাইতে যাইয়া সুধু বাঁশীর কথা না বলিয়া গরুড় ও আয়ুধের উল্লেখ স্বাভাবিক হইয়াছে মনে হয়।

(১) চঢ়িলা কালীয়নাগ শীরে।
গরুড়বাহন মহাবীরে ॥—পৃঃ ২৩৫.

(২) শঙ্খচক্র গদা করে গরুড়বাহন ল
আচ্ছে দেব সারঙ্গধরে।—পৃঃ ২৮৮.

পরবর্ত্তী বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণের আয়ুধ ও বাহনকে বাতিল করিয়া দিলেও গীতগোবিন্দে (১. ১৯) গরুড়াসন কথা আছে। আমাদের ধর্ম্মপূজাবিধানেও কৃষ্ণকে স্পষ্টতঃই 'মহাগরুড়-বাহনং' বলা হইয়াছে।

প্রসাধন

চণ্ডীদাস পৌরাণিক সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, তাহা আমরা তাঁহার গ্রন্থের নানা স্থান আলোচনা করিলেই দেখিতে পাই। কৃষ্ণলীলার অতি প্রাচীন কোন কোন চিহ্ন তাঁহার গ্রন্থে লুকাইয়া আছে। কিন্তু তিনি পণ্ডিত হইয়াও কবি ছিলেন, তাই কাব্যের অনুরোধে তাঁহার শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য কৃষ্ণকে তাঁহার সময়ের গ্রাম্য যুবকরূপে দেখাইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। এ বিষয়ে আর কোন কবি তাঁহার সমকক্ষ আছেন কি না, জানি না। তাঁহার কৃষ্ণের প্রসাধনের দিকে লক্ষ্য করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

(১) কৃষ্ণের "নীল কুঞ্চিত ঘন দীর্ঘ কেশের" কথা শুনিলে অবশ্য খুব আভিজাত্যেরই সূচনা করে। এই কথা মাত্র একবার আছে ও হরিবংশ হইতে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে বার বার তাঁহার ঘোড়াচুলের উল্লেখ আছে (পৃঃ ১৭৭,২৬৫.)। এই ঘোড়াচুল এক সময়ে বাঙ্গলা দেশে খুব চলিত ছিল। একজন সিদ্ধা বা নাথপন্থী যোগীর নাম ছিল ঘোড়াচুলী। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে অমরকোষের বাঙ্গালী টীকাকার সর্ব্বানন্দ এই শব্দকে সংস্কৃত করিয়া ঘোটাচূড় রূপ দিয়াছেন, এবং অর্থ করিয়াছেন,—"কাকপক্ষদ্বয়ং ঘোটাচূড় ইতি খ্যাতে। ক্ষত্রিয়কুমারাণামুপনয়নকৃতে শিখাপঞ্চক ইত্যন্যে।" ঘোড়ার মত বড় চুল রাখা লোকে একটা বাহার মনে করিত। মারামারির সময়ে এই চুল বড় বিপদের কারণ হইত।

কেহো ধরে ঘোড়াচুলে কেহো ধরে হাথে।—কৃ. কী. পৃঃ ২৬৫. এই লম্বা চুল দিয়া চূড়া বান্ধিবার কথা খুব পাওয়া যায় বটে, কিন্তু চণ্ডীদাস জটা বান্ধিবার কথাও বলিয়াছেন,—

ময়ূর পুছে বান্ধি চূড়া　　　কেশপাশে দিআঁ বেঢ়া
কনয়া কুসুমে বান্ধি জটা।—কৃ. কী. পৃঃ ৩৪৬.

(২) চণ্ডীদাস কৃষ্ণকে মগর খাড়ু বা মকরমুখী খাড়ু পরাইয়াছেন (পৃঃ ৩০২)। এক সময়ে এইরূপ খাড়ু বাঙ্গলাদেশে খুবই প্রচলিত ছিল।

(৩) মকরখাড়ুর সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের ঘাঘর উল্লিখিত হইয়াছে। "ঘাঘর মকর পাএ" (পৃঃ ৩৪৬)। পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বানন্দের টীকায় এই শব্দটি ঘাঘরীরূপে পাওয়া যায়, এবং তিনি ইহার অর্থ করিয়াছেন,—কিঙ্কিণী। সে কালে পুরুষেরাও যে কিঙ্কিণী পরিত, তাহা বোধ হয়, আর কোথাও পাওয়া যায় না।

(৪) চণ্ডীদাস কৃষ্ণের হাথে বলয়া দিয়াছেন (পৃঃ ৩০২)। সে কালে বালকেরা বলয় পরিত, এখনও পশ্চিম অঞ্চলে তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়। ধর্ম্মপূজাবিধানেও কৃষ্ণের কথায় কঙ্কণের উল্লেখ আছে,—

করে কঙ্কণং।—পৃঃ ৫৪.

(৫) কৃষ্ণকে রাখাল বালক সাজাইতে যাইয়া শুধু নাগর করিয়া না রাখিয়া তাঁহার হাতে যথোপযুক্তভাবে লগুড়ের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

হাথেতে লগুড় বাঁশী বাএ সে সুরঙ্গে।—কৃ, কী, পৃঃ ৩৩৯

মহাযোগ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণকে মহাযোগেশ্বর বলা হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণলীলা-সাহিত্যে কোথাও তাঁহাকে যোগিরূপে বড় একটা দেখা যায় না। কারণ, তাঁহার ললিত ও বিদগ্ধ নায়ক-ভাবের সঙ্গে যোগের কোন মিল নাই। শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তির মধ্যে যোগের নির্লিপ্ততা ঘটিবার অবকাশ কোথায়? কিন্তু চণ্ডীদাস কৃষ্ণকে দিয়া যোগধ্যান করাইয়াছেন,—

(১) আক্ষে হরী আক্ষে হর আক্ষে মহাযোগী।—পৃঃ ১৯৮

(২) আহো নিশি যোগ ধেআই।—পৃঃ ৩৫৮

তারপর, কৃষ্ণের যে নিদ্রার কথা পাওয়া যায় (পৃঃ ৩১১), তাহা যোগনিদ্রা কি না, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। বাঙ্গলা দেশে যে কোন কোন সময়ে কৃষ্ণকে যোগী মনে করা হইয়াছে, তাহা আমরা অন্যান্য গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। ধর্ম্মপূজাবিধানে (পৃঃ ৫৪, ৫৫) দুই জায়গায় পরিষ্কারভাবে কৃষ্ণকে বলা হইয়াছে,—(১) যোগনিদ্রাসমাশ্রিত ও (২) ধ্যায়ী। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে কোথাও এ ভাব দেখা যাইবার উপায় নাই।

বিষ্ণুর একটি অসাধারণ মূর্ত্তি আছে, তাহার নাম 'যোগস্বামী'। ইহার সঙ্গে কৃষ্ণের এই রূপের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে (১ম অধ্যায়) পাওয়া যায়,—

পদ্মাসনসমাসীনঃ কিঞ্চিন্মীলিতলোচনঃ।
ঘোণাগ্রে দত্তবৃত্তিশ্চ শ্বেতপদ্মোপরি স্থিতঃ॥
বামদক্ষিণগৌ হস্তৌ উত্তানাবেকভাগগৌ।
তৎকরদ্বয়পার্শ্বস্থে পঙ্কেরুহমহাগদে॥
ঊর্দ্ধে করদ্বয়ে তস্য পাঞ্চজন্যঃ সুদর্শনঃ।
যোগস্বামী স বিজ্ঞেয়ঃ পূজ্যো মোক্ষার্থিযোগিভিঃ॥

দেহের দেব

চণ্ডীদাস কৃষ্ণকে কয়েক জায়গায় 'দেহের দেব' এইরূপ কথা বলিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে অনুরূপ ধারণা থাকিলেও ঠিক এইরূপ কথার প্রয়োগ পাওয়া যায় না। অতি প্রাচীন কালের উপনিষদেও এই ধরণের কথা পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণের ১৮ অংশে আছে,—'স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ঃ'… ভারতীয় চিন্তায় এই ধারণার খুবই প্রভাব বাড়িয়াছিল। বাঙ্গলা দেশের সহজিয়াদের হাতে ইহা খুবই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীরমেশ বসু

অনুমতি দেবী

যাঁরা ধর্ম্ম-বিজ্ঞান (Science of Religion) আলোচনা করেছেন, তাঁরাই অল্প বিস্তর জানেন যে, যুগে যুগে মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস ও কল্পনা-শক্তির প্রসারতা বা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে দেবতাদিগেরও প্রকৃতি, সত্ত্ব ও গরিমার কেমন তারতম্য ঘটে। উদাহরণস্বরূপ ধরুন বরুণদেব, ইনি আদিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের দেবতারূপে পূজিত হয়ে, পরবর্ত্তী আখ্যানে প্রকাশ পেলেন জল-সমূহের দেবতারূপে। অথবা অশ্বিদ্বয়, এঁরা দিন ও রাত্রির প্রতিনিধিস্বরূপ প্রথমে গৃহীত হয়ে, পরে দেববৈদ্যরূপে আদৃত হলেন। এই রকম, অনেক দেব-দেবীরই দেবত্ব বিষয়ে প্রাথমিক কল্পনা সকল যুগে সমান গ্রাহ্য হয়নি। এই তারতম্য যে কেবল হিন্দুর দেবদেবী সম্বন্ধেই আবদ্ধ বা প্রযোজ্য, তা নয়। যাই হোক্, অনুমতি দেবীর ইতিহাস আলোচনা করতেও যদি প্রকৃতিগত এরূপ পরিবর্ত্তন বা অসামঞ্জস্যের ধারা লক্ষিত হয়, তবে বিস্ময়ের কোনও কারণ থাক্‌তে পারে না। অনুমতির (অনু+মন্+অধিকরণে ক্তিন্) শব্দগত অর্থ সম্মতি, অনুজ্ঞা, অনুমোদন ইত্যাদি, অর্থাৎ মানসিক একটী বৃত্তি-বিশেষ। দেখা যায়, শ্রদ্ধা, ধারণা, 'মেধা' প্রভৃতি বৃত্তিতে যে ভাবে দেবীত্ব আরোপ করা হয়েছে, 'অনুমতি'র উপরেও তেমনি ভাবেই হয়েছে। সাধারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, মানসিক বৃত্তির উপর পরিকল্পিত যে সকল দেব-দেবী, তাঁদের উদ্ভাবনা অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগে হয়েছিল; অন্ততঃ মানবীয় সভ্যতার একান্ত শৈশবাবস্থায় নয়। কারণ, আগে মানুষের বাহিরের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবে, স্থূলের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হবে, তবে সে ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করবার যোগ্যতা পাবে, সূক্ষ্মের ধারণা করতে সক্ষম হবে। ক্রমশঃ মানুষ বহিঃপ্রকৃতির স্থূল ঘটনা বা অবয়ব দেখে, সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়েই হ'ক, অথবা ভয়ে আবিষ্ট হয়েই হ'ক, দেব-দেবীর কল্পনা বা আখ্যান সৃষ্টি করেছিল, তার পরে ক্রমশঃ অন্তর্জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করবার মত পরিপুষ্ট জ্ঞান বা শক্তি লাভ করেছিল। এ স্বীকার না করলে মানবের আত্মপ্রকাশের যে একটা নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস বা ক্রমসূত্র আছে, সেটা নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই প্রকৃতির রূপ বা রহস্যের পরিকল্পনায় সৃষ্ট দেব-দেবী অপেক্ষা, এই মনোবৃত্তি-নিষ্পন্না অনুমতি দেবীকে কিছু আধুনিক সৃষ্টি বলে মেনে নওয়া চলে। কত আধুনিক, তা কেউ বল্‌তে পারে না; পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন, মনের বৃত্তি বা ইন্দ্রিয়-বিশেষকে দেবতার স্বরূপ দান করার প্রথা আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করার আগেও অভ্যাস করেছিলেন, এ বৈদিক যুগের নিজস্ব কোনও বিশিষ্ট উদ্ভাবনা নয়।

অনুমতিকে দেবীরূপে কল্পনা করে বলা হয়েছে, ইনি দেবতাদের সম্মতির বা

অনুগ্রহের দেবী। মানেটা যে খুব পরিষ্কার, তা নয়। কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন, ইনি দেবতাদের প্রসন্নতার সহিত পূজা ও অর্ঘ্য গ্রহণ করার প্রতিনিধান করেন। যাই হোক্‌, চরিত্রের এই এক বিশেষত্বে এঁকে আগাগোড়া যে দেখতে পাব না, এ আভাস আগেই দেওয়া হয়েছে। ধাতুগত অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে অনুমান হয়, এঁর প্রথম রচনা এরূপ কল্পনা থেকেই হয়েছিল। পরবর্ত্তী কল্পনায় ইনি প্রকাশ পেলেন—চন্দ্রের একটী কলার দেবীরূপে। চন্দ্রের আরও তিনটী কলার দেবী বৈদিক যুগে ন্যূনাধিক প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, যথা—সিনীবালী, কুহূ ও রাকা। অষ্টকাদের ভিতরেও কেউ কেউ যে আর্য্যদের নিকটে কতক পরিমাণে আদৃতা না হয়েছিলেন, তা নয়; কিন্তু সে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগে। অনুমতি, সিনীবালী, কুহূ ও রাকা, এঁদের ভিতরে কে কোন্‌ কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তার সম্বন্ধেও স্থানে স্থানে অল্প-স্বল্প বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বেশীর মতে অনুমতি দুই প্রহর চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমার দেবী এবং সিনীবালী, কুহূ ও রাকা যথাক্রমে চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবস্যা, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দেবী। আমাদের বর্ত্তমান আলোচনা যাঁকে নিয়ে, তাঁর সম্বন্ধে মতান্তরের কথাই আমরা বলব। যজুর্ব্বেদের ৩।৩১১ শেষ মন্ত্র অনুসারে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এ স্থলে অনুমতিকে পূর্ণিমার দেবী বলেই ভাবা হয়েছে। এমনটী আর কোথাও দেখা যায় না। অবশ্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।১১) অনুমতিকে প্রথম পূর্ণিমার এবং রাকাকে দ্বিতীয় পূর্ণিমার দেবী বলে নির্দ্দেশ করেছেন। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এখানে বুঝি দুইটী পূর্ণিমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তা যে নয়, কীথ সাহেবের ব্যাখ্যা থেকেই তা প্রতিপন্ন হতে পারে। তিনি বলেন, একটীতে সূর্য্যাস্তের সময় সূর্য্য এবং পূর্ণচন্দ্রের একই সময়ে নয়নগোচর, এবং অপরটীতে সূর্য্যাস্তের পর পূর্ণচন্দ্রের দৃষ্ট হওয়ার কথা বলা হয়েছে মাত্র। যাই হোক্‌, মতাধিক্যের অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত করতে হয়, অনুমতি চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমার দেবী, 'ন্যূনেন্দুকলাপূর্ণিমা'।

চন্দ্রকলাগণ কেন এত লোকপ্রিয় হলেন, তা জান্‌তে কৌতূহল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কৌতূহল চরিতার্থ করাও সোজা নয়। তবে উপনিষদে চন্দ্র বা সোমের সহিত পিতৃপুরুষগণের একটা সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকার কথা নিঃসংশয়ে মেনে নেওয়া হয়েছে। এমনও হতে পারে যে, উপনিষদের আগের যুগেও চন্দ্রের সহিত পিতৃপুরুষগণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ অনুভূত হওয়ায়, পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অর্ঘ্যের সহিত চন্দ্রেরও একটা সংযোগ ভেবে লওয়া হত। তাই চন্দ্রকলাদেরও সমাদর।

অনুমতি দেবীর প্রথম পরিচয় পাই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে। ১০।৫৯।৬ ঋক্‌ বলেন, "অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগং। জ্যোক্‌ পশ্যেম সূর্য্যমুচ্চরং তমনুমতে মৃড়য় নঃ স্বস্তি॥" ওগো অসুনীতি, আমাদের পুনরায় দৃষ্টিপ্রদান কর, পুনরায় আমাদিগকে প্রাণ দান কর এবং ভোগ করতে দাও। আমরা যেন বহুকাল ধরে ঊর্দ্ধগামী সূর্য্যকে দেখতে পাই। ওগো অনুমতি, আমাদিগকে অনুগ্রহ কর, স্বস্তি দাও।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ১৬৭।৩ ঋকেও অনুমতি দেবী ও বৃহস্পতির শরণ লাভ করার কথা উল্লিখিত হয়েছে। যথা—"সোম এবং বরুণ আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, বৃহস্পতি এবং অনুমতি মঙ্গল কচ্ছেন, হে ইন্দ্র, তোমার প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হয়েছি" ইত্যাদি।

সারা ঋগ্বেদে মাত্র এই দুই স্থান ব্যতীত অনুমতির স্পষ্টোল্লেখ আর কোথাও নাই। কিন্তু এ থেকে বোঝা যায় না, অনুমতিকে কি ভাবে, কোন্‌রূপে প্রার্থনা করা হয়েছে। হতে পারে দেবতাদের অনুগ্রহের দেবীরূপে, হতেও পারে চন্দ্রকলার দেবী মনে করে'। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভিতরে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, ঋগ্বেদীয় আর্য্যের গ্রহ উপগ্রহ সম্বন্ধে এত সূক্ষ্ম, সম্যক্ ও গভীর জ্ঞান জন্মেছিল কি না, যার দ্বারা চন্দ্রের কলা-বিভাগ করে তাদের উপর দেবীত্ব আরোপ করতে সমর্থ হওয়া যায়। কিন্তু সায়নাচার্য্য ঋগ্বেদের নবম মণ্ডল, ৭৪ সূক্ত, ষষ্ঠ ঋকের যে টীকা দিয়েছেন, তাতে করে এ সন্দেহ অমূলক মনে হয়। ৯।৭৪।৬ ঋক বলেন,—"সহস্রধারেঽব তা অসশ্চতস্তৃতীয়ে সংতু রজসি প্রজাবতীঃ। চতস্রো নাভো নিহিতা অবো দিবো হবির্ভরংত্যমৃতং ঘৃতশ্চুতঃ॥" দ্বিতীয় পংক্তির 'চতস্রো' শব্দ সায়নের মতে অনুমতি, সিনীবালী, কুহূ ও রাকা অর্থাৎ চন্দ্রের এই চারি কলার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। তা ছাড়া রাকা, সিনীবালীর উল্লেখ ঋগ্বেদ নিজেই করেছেন। এ থেকে অনুমান হয়, অনুমতিকে কেবলমাত্র 'দেবতাদের অনুগ্রহের দেবী'রূপে পরিকল্পনা ঋগ্বেদের অন্ততঃ নবম মণ্ডল রচনার পূর্ব্বেই করা হয়েছিল।

কিন্তু ঋগ্বেদীয় যুগে অনুমতি দেবীর প্রাধান্যটা তেমন কিছু অধিক ছিল না। বরঞ্চ মনে হয়, সে যুগে তিনি একজন সামান্যা বা অপ্রধানা দেবী বলে পরিগণিত হতেন। এ শুধু এঁর সম্বন্ধে নয়, ঋগ্বেদের প্রায় সকল দেবীর পক্ষেই এ কথাটী অল্পবিস্তর প্রযোজ্য। একমাত্র উষাদেবী ব্যতীত ঋগ্বেদে পৃথিবী, সরস্বতী, ভূমি, রাত্রি, পৃশ্নি, সরণ্যূ প্রভৃতি কোনও দেবীরই নিজের একটা গরীয়সী সত্তা বিশেষ করে প্রকটিত হয় নি। মোটামুটি হিসাবে বল্‌তে গেলে, সে যুগে দেবীর চেয়ে দেবের প্রাধান্য বেশী ছিল। আসীরীয়গণ যেরূপ তাঁদের দেবীগণকে স্বীয় পতি-দেবতাদের (husband gods) ছায়ার মত পরিকল্পনা করতেন, ঋগ্বেদীয় যুগ সম্বন্ধে ঠিক অতখানি বলা না চল্‌লেও, দেবীর স্থানকে যে খাটো করে রাখা হয়েছে, এ কথা স্বচ্ছন্দেই স্বীকার করে লওয়া যেতে পারে। এ ভিন্ন মনোবৃত্তি-নিষ্পন্ন দেবতাদের বিষয়ে আরও বিশেষ করে বলা যায় যে,এঁরা খুব কম জায়গায়ই প্রাকৃতিক দৃশ্য বা ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত বা কল্পিত দেব-দেবীর সমকক্ষ বলে গণ্য হতে পারেন।

যজুর্ব্বেদের ১।৮।৮ যজুঃ অনুমতি, রাকা, সিনীবালী এবং কুহূ, এই চারিটী দেবীর প্রতি অর্ঘ্য নিবেদনের কথা বলেছেন। এখানেও মনে হয়, এঁদের প্রকৃতি কিছু সন্দেহযুক্ত হয়ে আছে। ৩।৩।১১ যজুঃ অনুমতি সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা কতকটা এইরূপ,—"আজ যেন অনুমতি দেবতাদের নিকট আমাদের যজ্ঞ অনুমোদন করেন, এবং তিনি ও অর্ঘ্য-বাহী অগ্নি দাতার আনন্দস্বরূপ হন।" তার পরেই অনুমতিকে স্মরণ করে উপাসনা করা হয়েছে,—"ওগো

অনুমতি, তোমার অনুগ্রহ দান কর, আমাদের সম্পদ্ দাও ; প্রেরণা এবং অন্তর্দৃষ্টির জন্য আমাদের প্রণোদিত কর ; আমাদের নিমিত্ত আমাদিগের দিন (আয়ু) বৃদ্ধি কর।" পরবর্ত্তী কালে অনুমতির প্রকৃতির নব বিকাশের বা স্ফুরণের যে পরিচয় পাওয়া যায়, ৩.৩।১১ যজুঃ অনুমতি সম্পর্কে আরও যা বলেছেন, তার থেকেই প্রথম আভাস পাওয়া যায়। বলেছেন,—"তিনি (অনুমতি) যেন অনুগ্রহ করে আমাদিগকে অক্ষয় ধন ও বহু সন্ততি দ্বারা অনুগ্রহ করেন ; তাঁর বিরাগে যেন আমরা পতিত না হই ; এই সহজসাধ্যা দেবী যেন আমাদের রক্ষা করেন।" এখানে লক্ষ্য করার প্রধান কথা হচ্ছে, 'বহু সন্ততি দ্বারা অনুগ্রহ করা'। যিনি কেবলমাত্র 'দেবানুগ্রহের দেবী', যাঁর উপরে দেবতাদের সমক্ষে যজ্ঞ অনুমোদন করে দিবার ভারই কেবলমাত্র ন্যস্ত, তাঁর কাছেই আবার প্রজা-লাভের নিমিত্ত উপাসনা করা হয় কেন? বস্তুতঃ এর সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। কিন্তু যদি চন্দ্রকলার দেবী ভেবে নেওয়া যায়, তবে অবশ্য কতকটা সঙ্গতি পাওয়া যায়। কল্পনায় একটা জিনিস প্রথম রচনা করা বা খাড়া করে তোলা যত কঠিন, একবার রচিত হলে তাকেই আবাব নানা ভাবসম্পদে সাজিয়ে তার উপর নানা বর্ণ, গুণ ও বৈশিষ্ট্য আরোপ করা ততটা কঠিন নয়। যে ভাবে প্রণোদিত হয়েই হোক্, চন্দ্রকলাকে দেবীত্ব প্রয়োগ করে উপাসনা নিয়ন্ত্রিত হল। কিন্তু চন্দ্রের কিরণে যে সুধা বর্ষিত হয়, যে মাদকতা মানুষের গোপন অন্তরকে চঞ্চল ক'রে তোলে, যে মধু মানবের সারা দেহ মনকে নিভৃতে উদ্‌ভ্রান্ত করে, তাকে উপেক্ষা করে চল্‌তে অশক্ত হয়ে আর্য্যগণ যদি প্রজনন বা উৎপাদিকা শক্তির একটা সংশ্লিষ্টতা মনে মনে এঁকে নিয়ে অনুমতি দেবীর (এবং অন্যান্য কলাদেরও) প্রতি সন্তান-কামনা ক'রে থাকেন, তবেই এর একটা সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

অথর্ব্ববেদে অনুমতি দেবীর চরিত্রের আরও নানা দিক্ বিকাশ পেয়েছে। অথর্ব্ববেদকে অনেক ক্ষেত্রে বৈদিক ক্রমাভিব্যক্তির মূল ধারার কিছু বাইরে বলে বিবেচনা করা হয়। কারণ, ভাবাত্মকতা বা ভাবের নিগূঢ়তা এর মন্ত্রগুলিতে অপেক্ষাকৃত অল্প করে ফুটেছে। পক্ষান্তরে কবি-কল্পনাকে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে যত দূর নেওয়া যায়, ইনি তা করবার চেষ্টা করেছেন। যথা,—বৃষ ও বশা (গবী), এঁদের বল্লেন, এঁরা ঈশ্বরের সমতুল। দর্ব্বি (হাতা), দর্ভতৃণ-কবচ, পুরোহিত বা মুনিদের জন্য প্রস্তুত যবাদির মণ্ড, যজ্ঞোৎসর্গীকৃত বৃষ, এ সবের ধ্যান কল্লেন আদ্য-শক্তিগণের অনুরূপ চিন্তা করে। কাল (সময়)কে প্রজাপতি জ্ঞানে এবং সর্ব্বলোকসৃষ্টিকর্ত্তারূপে স্তুতিবাদ সুরু করে দিলেন। আর অনুমতি দেবী সম্বন্ধে প্রচার করলেন,—"অনুমতিঃ সর্ব্বং ইদং বভূব যৎ তিষ্ঠতি চরতি যৎ উ চ বিশ্বং এজতি। তস্যাস্তে দেবী সুমতৌ স্যাম অনুমতে অনু হি মঙ্‌সসে নঃ" ॥ (৭।২০।৬) ॥ এই যে সর্ব্ববিশ্ব ও চরাচরের সহিত অনুমতি দেবীর একত্ব কল্পনা, এ অথর্ব্ববেদেই প্রথম সম্ভব হয়েছিল। সম্ভবতঃ এরই প্রতিধ্বনি করে শতপথব্রাহ্মণও বলেছেন,— অনুমতিই এই বিশ্ব। (২।৩,৪) ॥ ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ আর এক দিয়ে বলেছেন,—'যানুমতিঃ সা গায়ত্রী' (৩।৪৭-৪৮) ॥

এ ভিন্ন অথর্ব্ববেদ অনুমতি দেবীকে আর কি কি ভাবে এবং কোন্ কোন্ ক্রিয়ানুষ্ঠানে উপাসনা করেছেন, আমরা তা দেখাচ্ছি। সাধারণভাবে প্রার্থনাও করেছেন। ৭।২০।১-২ অথর্ব্বন্ বলেন,—"ওগো অনুমতি, আজকের দিনে দেবতাদের সাক্ষাতে আমাদের যজ্ঞ অনুমোদন কর। ওগো অনুমতি! আমাদিগকে স্বাস্থ্য ও সুখ প্রদান কর। এই উৎসর্গীকৃত যজ্ঞ গ্রহণ কর।" এবং তার পরেই বলেন,—"ওগো দেবি, আমাদিগকে প্রজা (সন্ততি) দান কর।" সন্তান কামনায় সে যুগের জনক জননীও যে কন্যা অপেক্ষা পুত্রকে অধিকতর বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করতেন, তার আভাস অথর্ব্ববেদও দিয়েছেন। ৬।১১।৩ অথর্ব্বনে দেখা যায়, পুংসবনক্রিয়াকালে সন্তানেচ্ছু, কন্যার পরিবর্ত্তে পুত্রলাভার্থ প্রজাপতি, অনুমতি ও সিনীবালীর নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছেন। ভাবার্থ এই যে, গর্ভোৎপাদনের দেবীরূপে অনুমতি ও সিনীবালী যে ভ্রূণ গঠন করেছেন, প্রজাপতির আশীর্ব্বাদে উহা যেন পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়। গর্ভ-সঞ্চার ও সহজ-প্রসবের আকাঙ্ক্ষায় *প্রাচীন ল্যাটীন্ জাতির ভিতরেও লুসিনা-দেবীর* (*Lucina, Lucna, Luna,* the Moon) নিকট প্রার্থনা জানাবার প্রথা ছিল। ১।১৮।২ অথর্ব্বন্ সবিতৃ, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমন্ এবং অনুমতির নিকট যে উপাসনা ক'চ্ছেন, তার উদ্দেশ্য এই যে, কোনও নারীবিশেষের দেহে অসৌভাগ্যকর চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, তা বিদূরিত করা এঁদের অনুগ্রহসাক্ষেপ। পুরুষ নারীর প্রতি আকৃষ্ট হতে চায় না; অথচ নারী তারই হৃদয়ে লালসাময় প্রেম উৎপাদন কর্ত্তে ব্যগ্র হয়েছে; নারী তখন দেবতাদের ডেকে বল্লে,—"হে দেবগণ, ওঁর প্রাণে লালসা জাগাও; উনি যেন আমার প্রতি ভালবাসার আগুনে দগ্ধ হতে থাকেন।" অনুমতিকেও স্মরণ করে বল্লে,—"ওগো অনুমতি, তুমি এতে সম্মতি দাও।" (৬।১৩১।১-২ অথর্ব্বন্)॥ এরূপ মন্ত্রপাঠের সহিত সে কালে নাকি একটা অনুষ্ঠানেরও সংযোগ ছিল। যে পুরুষের প্রেম যাজ্ঞা করা হত, তার আসনে, গৃহে বা শয্যায় অথবা সে যে পথে হাঁটে, সেই পথে প্রথমতঃ কতকগুলি মাষ নিক্ষেপ করা হত। এর গূঢ়ার্থ এই যে, মাষ নাকি কামোদ্রেক করে, এবং সে জন্যই কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বদিনে উপবাস কর্ত্তে হলে মধু, মাংস, সুরা, ক্ষার, মাষ প্রভৃতি ব্যবহার নিষিদ্ধ। যাই হোক্, অনুষ্ঠানকালে আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের একটী প্রতিমূর্ত্তি গড়ান হত। সেটির মুখ থাকৃত অনুষ্ঠানকারিণীর দিকে। তার পর কতকগুলি শরাগ্রে আগুন জ্বালিয়ে সেই প্রতিমূর্ত্তির দিকে দিকে স্থাপিত করে তবে মন্ত্রপাঠ করা হত। এ ছাড়া, ৫।৭।৩-৪ অথর্ব্বন্ অনুসারে দেখা যায়, যাজ্ঞিক বা পুরোহিত তাঁর দক্ষিণার পরিমাণ কম্তি না ঘটে, এ জন্য সরস্বতী, অনুমতি ও ভগের নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

পুরাকালে কৃষি সম্বন্ধীয় কতকগুলি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হত। গাভীগুলিকে গো-চারণে নিয়ে গিয়ে পুনরায় গোশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করাবার জন্য এবং গোধন যাতে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, তার জন্য রীতিমত মন্ত্রপাঠ ও সংস্কারাদি নিষ্পন্ন করা হত। যে সমস্ত দেবদেবীর

নিকট এ জন্য উপাসনা করা হত, তাঁদের মধ্যে অনুমতি দেবী অন্যতমা। ২।২৬।২ অথর্ব্বন্ বলেন,—"এই গোশালায় গাভীগুলি একত্র আগমন করবে ; বৃহস্পতি এদের নৈপুণ্য সহকারে চালনা করবেন ; সিনীবালী এদের পুরোভাগকে এখানে পথপ্রদর্শন করবেন ; ওগো অনুমতি, এরা আগত হলে তুমি এদের যথাস্থানে ধারণ করে রেখো।" সিনীবালী এবং অনুমতি, উভয়েই যখন চন্দ্রকলা এবং উভয় কলাই যখন ন্যূনাধিক কিরণ দান করেন, তখন এঁদের উদয়ে প্রত্যাবর্ত্তনের পথ নিরন্ধকার থাকবে, এরূপ কল্পনায় উপরোক্ত প্রার্থনা অস্বাভাবিক নয়। কৃষি সম্বন্ধীয় আরও কয়েকটী অনুষ্ঠান সে কালে যত্ন সহকারে পালন করা হত, তন্মধ্যে হলানুষ্ঠান একটী। হল-যোজনা সাঙ্গ হলে এ অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন করা হত। ক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকে হলের সম্মুখে, সাধারণতঃ পৃথিবী ও দ্যৌর (আকাশের) উদ্দেশ্যে, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বা অন্য কোনও শুভ দিনে একটী অর্ঘ্য প্রদান করা হত। এ ছাড়া এ উপলক্ষ্যে অন্যান্য উপাস্য দেবতাদের ভিতরে ইন্দ্র, পর্জ্জন্য, অশ্বিদ্বয়. মরুদ্গণ, উদলাকাশ্যপ, স্বাতিকারী, সীতা, অনুমতি প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অনুষ্ঠানক্রিয়া সমাপ্ত হলে বৃষগণকে মধু ও ঘৃত আহার করতে দেওয়া হত। এর বিশেষ বিবরণ পারস্কর-গৃহ্যসূত্রে (২।১৩।১-২) পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদ থেকে আরও একটী তথ্য জানা যায় যে, উৎপাদনের দেবী বলে গাভীরও বন্ধ্যাত্ব দূর করবার অভিপ্রায়ে অনুমতি দেবীর নিকটে প্রার্থনা করা হত।

খাঁটি বৈদিক যুগের পরেও হিন্দুর চোখে অনুমতি দেবীর প্রভাব ও মর্য্যাদা ক্রমশঃ কতখানি পরিব্যাপ্তি লাভ করেছিল, তার নিদর্শন নানা শাস্ত্রগ্রন্থ হতে কিছু কিছু সংগ্রহ করা যেতে পারে। এমন কি, রাজসূয়, পুরুষমেধ প্রভৃতি সে কালের বড় বড় যাগ-যজ্ঞেও এ দেবীটিকে বাদ দেওয়া হত না। রাজসূয়যজ্ঞারম্ভে দীক্ষার প্রথম দিনে (১লা ফাল্গুন) কতকগুলি আনুক্রমণিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে, দ্বিতীয় দিনেই অনুমতি এবং নির্ঋতিকে অর্ঘ্য প্রদান করার ব্যবস্থা ছিল। ২।৩।১-৪ শতপথব্রাহ্মণ বলেন, অভিষেচনীয়-কালে নরপতিকর্ত্তৃক প্রথম দিন পূর্ণাহুতি প্রভৃতি দান করা হত, পরদিন অষ্টকপালে অনুমতি দেবীর যজ্ঞাহারের নিমিত্ত পিণ্ড প্রস্তুত করা হত ; কারণ, অনুমতিই এই পৃথিবী ; এবং যিনি স্বীয় অভিলষিত ক্রিয়া সম্পন্ন করতে জানেন, তাঁর নিমিত্তই তিনি (অনুমতি) অনুমোদন করেন ; এই জন্যই তিনি (নরপতি) তাঁকে (অনুমতিকে) প্রসন্ন করেন, এই ভেবে যে, "আমি যেন অনুমতির দ্বারা অনুমোদিত হয়ে সংস্কৃত হতে পারি।" ১৬।১০।১১ শাঙ্খায়নসূত্র অনুসারে পুরুষমেধ যজ্ঞনির্ব্বাহকালে অনুমতি, পথের মঙ্গলকারিণী দেবী (পথ্যা-স্বস্তি) এবং অদিতির নিকট এক বৎসর ক্রমাগত দৈনন্দিন অর্ঘ্য প্রদত্ত হত। শাঙ্খায়ন-সূত্র (২।১৪।৪) থেকে আরও জানা যায়, বৈশ্বদেব-যজ্ঞ সম্পাদনকালেও সন্ধ্যায় এবং প্রত্যূষে সোম, অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভরদ্বাজ, ধন্বন্তরি, বিশ্বদেবগণ, প্রজাপতি, অদিতি, অনুমতি, অগ্নি-স্বিষ্টিকৃৎ প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে অর্ঘ্য দান করা হত। পুরু-

মহাযজ্ঞকালেও যে অনুমতি দেবীকে বঞ্চিত করা হত না, ২।৯।২ পারস্কর-গৃহ্যসূত্র হতে তাও জানা যায়। এতদ্ভিন্ন, খাদির-গৃহ্যসূত্র উল্লেখ করেন যে, সোমযজ্ঞের সহিত অগ্নি-বেদীর চতুর্দ্দিকে জলসিঞ্চন করার যে একটী অনুষ্ঠান সম্পাদন করার প্রথা ছিল, সেই সময়েও পশ্চিমমুখী হয়ে অনুমতির সম্মতি ভিক্ষা করা হত (১।২।২৮)।

এমন কি, সে যুগের ছাত্রগণও এ দেবীটির পূজা হতে নিষ্কৃতি লাভ করতেন না। সে কালে এ কালের মত নিত্য পাঠাভ্যাসের ব্যবস্থা ছিল না, মধ্যে মধ্যে সময় ও অবস্থা-ভেদে তাঁদের পাঠ থেকে নিরত থাকৃতে হত। বৎসরান্তে পাঠারম্ভের নির্দ্দিষ্ট সময়ে (সাধারণতঃ বর্ষাসমাগমে) ছাত্রদিগকে যে অনুষ্ঠানটী সম্পাদন করতে হত, তার নাম ছিল অধ্যায়োপাকর্ম্ম। এই অধ্যায়োপাকরণকালে তাঁরা হয় সমস্ত ঋগ্বেদ, নয় কতকগুলি অধ্যায়ের গোঁড়ার সূত্রগুলি উচ্চারণ করতেন এবং ঘৃত-দুগ্ধ-বিমিশ্রিত তণ্ডুল দ্বারা অর্ঘ্য রচনা করিয়া দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতেন। বলা বাহুল্য, অপরাপর দেবতার সহিত অনুমতি দেবীও স্থান পেতেন। অনুষ্ঠানশেষে পুনরায় তিন দিন পাঠ বিরাম থাকৃত। অধ্যায়োপাকর্ম্মে অনুমতী দেবীর উদ্দেশ্যে আজ্য-অর্ঘ্য প্রদান করার কথা কেবল পারস্কর-গৃহ্যসূত্রে (২।১০।৯) নয়, আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রেও (৪।৩।২৬) উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সকল ব্যতীত আরও কতকগুলি ক্রিয়ার সহিত অনুমতি দেবীর পূজা সংশ্লিষ্ট ছিল। ৪।৩।২৬ আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র বলেন, শ্রাদ্ধার্ঘ্য প্রদানকালে ক্রিয়ানুষ্ঠানকারী বাম হাঁটু নত করে প্রতিবার 'স্বাহা' উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নি, কাম, বসুধা এবং অনুমতির উদ্দেশ্যে দক্ষিণাগ্নিতে আজ্য অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। গোভিল-সূত্রে (২।৩।১৭-২০) নবদম্পতি-কর্ত্তৃকও অগ্নি, প্রজাপতি, বিশ্বদেবগণ এবং অনুমতিকে অর্ঘ্য প্রদানের ব্যবস্থা আছে দেখা যায়।

মনুও অনুমতি দেবীর উল্লেখ করেছেন। ৩।৮৪ ও ৮৬ শ্লোকে বলেছেন, ব্রাহ্মণ নিজ নিজ গৃহসূত্রানুসারে বৈশ্যদেবের নিমিত্ত পক্কান্নের একাংশ গৃহাগ্নিতে (নিম্নলিখিত) দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রদান করবেন,—প্রথমতঃ অগ্নি, তার পরে সোম, পরে উভয়কে একত্র, তার পরে বিশ্বেদেবগণ, তার পরে ধন্বন্তরি ইত্যাদি, এবং তারপরে কুহূ, অনুমতি, প্রজাপতি, দ্যৌ, পৃথিবী, অগ্নি-স্বিষ্টকৃৎ। (যথা—কুহ্বৈ চৈবানুমত্যৈ চ প্রজাপতয় এব চ। সহ দ্যাবা-পৃথিব্যোশ্চ তথা স্বিষ্টকৃতেঽন্ততঃ ॥ ৩।৮৬।)

সারা মনুসংহিতায় অনুমতি দেবীর নাম কেবল এই একটী স্থানেই খুঁজে পাওয়া যায়। এর পরে কবে থেকে যে এই দেবীটীর খ্যাতি লঘুতর হতে লাগল, তা কিছুই নির্দ্ধারণ করা যায় না। বিষ্ণুপুরাণ রচনাকালেই এঁর নামের সঙ্গে কতগুলি উপাখ্যান বিজড়িত হতে আরম্ভ করেছিল। বিষ্ণুপুরাণের দশম অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, অঙ্গিরা-পত্নী স্মৃতিদেবী সিনীবালী, কুহূ, রাকা এবং অনুমতিনাম্নী চারি কন্যাকে প্রসব করেছিলেন। ভাগবত-পুরাণ অনুসারে স্বারোচিষ মন্বন্তরে উতথ্য এবং বৃহস্পতি নামধেয় মুনিদ্বয়ও অঙ্গিরসের

পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; অর্থাৎ এঁদেরই ভগ্নী হলেন অনুমতি ইত্যাদি। অথচ কিন্তু বিষ্ণুপুরাণই আবার অষ্টম অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অনুমতি প্রভৃতিকে চন্দ্রের কলা-রূপেই ব্যক্ত করেছেন।

যাই হোক্, আজকের হিন্দুসাধারণের নিকট এই দেবীটির নামও অজ্ঞাতপ্রায়। উত্থান ও পতন, সংসারের এই চিরন্তন ধারা থেকে দেবতাদেরও বুঝি নিষ্কৃতি নাই! নইলে এতগুলি বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে, এমন কি, শ্রাদ্ধ এবং বিবাহাদিতেও যিনি হিন্দুর কাছ থেকে সমানে পূজার্ঘ্য দাবী করে আস্‌ছিলেন, সেই 'সহজ-সাধ্যা' দেবীও যে কেন যুগপ্রবাহে অনাদৃতা হতে লাগলেন, এ রহস্য ভেদ করা কঠিন।

শ্রীনলিনীনাথ দাশ গুপ্ত

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি কথা*

সম্প্রতি আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ মহাশয় "প্রকৃতি" নামক পত্রিকাতে বাঙ্গালা দেশের সমস্ত মৎস্যের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছেন। এই প্রবন্ধগুলি পাঠে একটী বিষয়ে আমি একেন্দ্রবাবুর সহিত একমত হইতে পারিতেছি না এবং সেই বিষয় আলোচনার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। আমার বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলার জন্য গোড়ার কথা সামান্যভাবে বলার প্রয়োজন হইতেছে। জীবজগতের শ্রেণী-বিভাগে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—

Sub-kingdom.
Class.
Sub-class.
Order.
Sub-order.
Super-family.
Family.
Genus.
Species.

এই প্রসঙ্গে বলা কর্ত্তব্য যে, সমস্ত ক্ষেত্রেই এতগুলি পর্য্যায়ানুসারে শ্রেণীবিভাগ হয় না। ডাঃ ঘোষের মৎস্যশ্রেণীর বর্ণনা-সম্বলিত প্রবন্ধই আমাদের আলোচ্য বিষয়। মৎস্য-শ্রেণী একাধিক শাখা-শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে এবং Teleostei তন্মধ্যে অন্যতম। Teleostei দুইটী বর্গে (order) বিভক্ত হইয়াছে এবং Isospondyli, Physostomi বা Malacopterygii তাহাদের অন্যতর। একেন্দ্রবাবু Sub-class ও Order—পরিচায়ক শব্দ দুইটির পরিবর্ত্তে দুইটী বাঙ্গালা শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং এই স্থলে মুখ্যতঃ তাঁহার সহিত আমার কোনও মতভেদ নাই। তবে আমি Teleostei শব্দের পরিবর্ত্তে "পূর্ণাস্থিক" শব্দ "অস্থিক" শব্দ অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি; কারণ, Teleostei যে দুইটী শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের একটীর (teleos) অর্থ 'সম্পূর্ণ' ও অপরটীর (osteos) অর্থ 'অস্থি'।

যাহা হউক, এই মতভেদের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে।

* ২১এ চৈত্র ১৩৩৪ তারিখে পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

Order বা বর্গের পর একেন্দ্রবাবু যে ভাবে শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, একেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধে আমাদের এ দেশের মৎস্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত মৎস্যের দেশজ নাম আছে। একেন্দ্রবাবু সেই সমস্ত নাম genus বা গণ হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন এবং ইহাই আমার আপত্তির বিষয়। বাঙ্গালা দেশের ইলিশ মৎস্য Clupea genusএর অন্তর্গত। একেন্দ্রবাবু এই "ইলিশ" শব্দ genus অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা সঙ্গত কি না, তাহাই আলোচ্য। দেশভেদে জীব ও উদ্ভিদের বিভিন্ন নাম আছে, কিন্তু এই সমস্ত দেশজ শব্দ জীব-তত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তকে ব্যবহৃত হয় না। কারণ, তাহা হইলে বক্তব্য বিষয় প্রণিধান করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ Homo sapiensএর কথা বলা যাইতে পারে ; কারণ, মানুষ শব্দের পরিচায়ক নানা সংজ্ঞা বিভিন্ন ভাষাতে থাকিলেও যে ভাষাতেই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিত হউক না কেন, বৈজ্ঞানিকগণ Homo sapiens এর প্রয়োগ করিবেন, অপর কোনও শব্দ প্রয়োগ করিবেন না। সুতরাং গণ হিসাবে Clupea শব্দের পরিবর্ত্তে ইলিশ শব্দের ব্যবহার আপত্তিজনক। একেন্দ্রবাবুর মত অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে গণবোধক (generic) নামের ন্যায় জাতিবোধক (specific) নামেরও প্রতিশব্দ প্রস্তুত করিতে হইবে এবং এই প্রথা যদি আমাদের দেশের জীব ও উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিদ্‌গণ গ্রহণ করেন, তবে বাঙ্গালা ভাষাতে কখনও উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের সৃষ্টি, এবং বলা বাহুল্য যে, বৈজ্ঞানিকের দরবারে জীব-বিদ্যাপ্রভৃতিবিষয়ক বাঙ্গালা সাহিত্যের কোনও স্থান হইবে না। কিঞ্চিদধিক ২০ বৎসর পূর্ব্বে পরিভাষা-গঠন সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়াছিলাম এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই পুনরুক্তি করিতেছি

বাঙ্গালা ভাষাতে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি লিখিবার সময় ক্রমশঃ আসিতেছে। সুতরাং কোন্ কোন্ শব্দের পরিভাষার অনুবাদ করিতে হইবে ও কোন্ কোন্ স্থানে অন্য ভাষাতে প্রচলিত শব্দই রাখিতে হইবে, সে সম্বন্ধে কতকগুলি মূল-সূত্র প্রণয়নের সময় উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের জন্য একাধিক সমিতি কার্য্য করিতেছেন। সমস্ত প্রদেশেই এক প্রথা অবলম্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আশা করি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া যথাবিহিত কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত

শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্-সি, এফ জেড এস্ মহাশয়ের মন্তব্য,—

আমি আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধটী পাঠ করিলাম।

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পৃঃ ২৪৮—২৫৩, ১৩১৩।

তাঁহার সহিত ইতিপূর্ব্বে এই বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে। আমার যাহা বক্তব্য, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমি Teleosteiএর প্রতিশব্দ দিয়াছি "আস্থিক"। হেমবাবু ঐ শব্দটীর মৌলিক অর্থ ধরিয়া "পূর্ণাস্থিক" নামের পক্ষপাতী। আমি বলি, যদি ছোট কথায় কাজ হয়, তবে বড় কথার দরকার কি? আর এমন কিছু মানে নাই যে, ঠিক ইংরাজি শব্দটীর অবিকল প্রতিরূপ গ্রহণ করিতেই হইবে। অনেক সময়ে সুবিধামত একটু পরিবর্ত্তন করিলে আরও ভাল দেখায়—শ্রুতিমধুর হয়, অথচ অর্থের কিছু বিপর্য্যয় ঘটে না। হেমবাবু আরও আপত্তি করিতেছেন যে, গণ অর্থাৎ genusএর বাঙ্গালা পরিভাষা হওয়া উচিত নয়। ইহা যে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবহার করা চলিবে না, সে বিষয়ে তাঁহাব সহিত আমার একমত। তবে আমি মনে করি যে, অনেক ভাষায় যেমন সাধারণের পাঠ্য প্রাকৃতিক ইতিহাসে genusএর দেশীয় নাম ব্যবহার আছে, আমাদের বাঙ্গালা ভাষায়ও সেইরূপ genusএর নাম গঠিত হওয়া উচিত; সেই জন্যই আমি গণের প্রতিশব্দ গঠন করিয়াছি। আমার প্রবন্ধটী বিজ্ঞান-সম্মত হইলেও সাধারণেব জন্যও লিখিত।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ

ফরিদপুর-কোটালিপাড়ার গ্রাম্য শব্দ *

বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালা দেশের গ্রাম্য শব্দগুলি সংগ্রহ করিবার একটা চেষ্টা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। তবে সকলেই যে, এই সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াই এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, এমন বলা যায় না। কেহ কেহ আমোদ উপভোগের জন্য—বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে তারিফ লইবার আশায় এরূপ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, এরূপ দুই একটী দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে। কলিকাতা বাগবাজারে গঙ্গা ও মহারাষ্ট্রখাতের সঙ্গমস্থলে বিদেশী নৌকার কৃত আদায়ের আফিসের একজন কর্ম্মচারী পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানের মাঝিদিগের ব্যবহৃত শব্দ লইয়া সুন্দর সুন্দর ছড়া রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার নিজ মুখেই একদিন আমি কতকগুলি ছড়া শুনিয়াছিলাম—তাঁহার নিকট হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিবার ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। নৌকার আফিসে সুদীর্ঘকাল কর্ম্ম করিয়া যিনি নানাদেশের মাঝিদের ভাষা সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, শুদ্ধ আমোদের জন্য রচিত হইলেও তাঁহার এই ছড়াগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাষাতত্ত্বালোচীর নিকট একটা বড় সম্পদ্ হইবে। আর একজনের কথা জানি। তিনি সংস্কৃত বাঙ্গালা মিশাইয়া বড় সুন্দর সুন্দর শ্লোক রচনা করিয়া সাধারণের তৃপ্তি জন্মাইতেন। তিনি একবার কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ লইয়া সংস্কৃতভাষায় হেমচন্দ্রের 'দেশীনামমালা'র অনুকরণে একখানি অভিধানের মত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থও সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় আছি। এইরূপ শব্দসংগ্রহ বাঙ্গালাদেশে আর কেহ কোথায়ও করিয়াছেন কি না, জানি না।

যতগুলি শব্দসংগ্রহ এযাবৎ পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ক্ষণজন্মা পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কৃত সংগ্রহই সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া মনে হয়। উহা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৮ম বর্ষে মুদ্রিত হইয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক শব্দসংগ্রহের চেষ্টা সেই প্রথম। তাহার পর হইতে বহু ব্যক্তি কর্ত্তৃক বঙ্গের বিভিন্ন জেলার বহু শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে। পরিষৎ-পত্রিকার যে যে খণ্ডে যে যে জেলার শব্দসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, ভবিষ্যৎসংগ্রাহকদিগের সুবিধার জন্য তাহার একটী বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বরিশাল (৯ম খণ্ড), ময়মনসিংহ (১২শ খণ্ড, [টাঙ্গাইল] ১৯শ খণ্ড), রঙ্গপুর (১২শ খণ্ড), মালদহ (১৪শ ও ১৮শ খণ্ড), পাবনা (১৪শ খণ্ড), যশোহর (১৫শ খণ্ড), ঢাকা (১৬শ খণ্ড), নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা (১৬শ খণ্ড ও ১৯শ খণ্ড), বগুড়া (১৯শ খণ্ড), মুরসিদাবাদ [জঙ্গীপুর ২২শ] (ঐ [কাঁদি] ৩৩শ ও ৩৪শ খণ্ড) বীরভূম (৩৪শ খণ্ড)। এই বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বসমেত ১০টী জেলার শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে, এখনও অধিকাংশ জেলারই শব্দ সংগৃহীত হয় নাই।

---

* ১৩৩৪।২৮এ চৈত্র নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ প্রস্তাব করিয়াছেন,—যে কয়টী জেলার শব্দ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদিগকেই সাজাইয়া গুছাইয়া একত্র সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে। তাহাতে বাঙ্গালার গ্রাম্য শব্দাভিধানের মূল পত্তন হইবে, সন্দেহ নাই। তবে এরূপ একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিধান প্রস্তুত করিতে হইলে কেবল সাধারণভাবে জেলাগুলির শব্দ সংগ্রহ করিলেই যথেষ্ট হইবে না—প্রত্যেক মহকুমার—সম্ভবপর হইলে প্রত্যেক পরগণার শব্দ সঙ্কলন করিতে হইবে। ইহাতে অনেক লোকের, অনেক সময়ের এবং অনেক অর্থের প্রয়োজন হইবে, সন্দেহ নাই। ইংরাজী ভাষার Dialectic Dictionary প্রস্তুত করিতে সম্পাদক Professor Wrightকে শুধু শব্দ সংগ্রহ করিবার জন্য এক সহস্র লোকের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। এই বিশাল গ্রন্থের মালমসলা সংগ্রহ করিতে পঁচিশ বৎসরের নিরন্তর পরিশ্রমের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য তিন সহস্রের অধিক শব্দসংগ্রহ-গ্রন্থ আলোচনা করিতে হইয়াছিল। এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যেই স্থাপিত English Dialectic Society ৮০ খণ্ড শব্দসংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

তবে সেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিধান বাঙ্গালা দেশ হইতে কোনও দিন প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর হউক আর না হউক, বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলার লোকের কর্ত্তব্য, স্ব স্ব জেলার গ্রাম্য শব্দগুলিকে সংগ্রহ করা। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রাম্য শব্দগুলি অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং এখন হইতে তাহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া পরিষৎপত্রিকায় মুদ্রিত করিয়া রাখিলে বাঙ্গালা ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনাকারীদিগের যথেষ্ট সুবিধা হইবে, সন্দেহ নাই।

এই উদ্দেশ্যেই আমি ফরিদপুরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত কোটালিপাড়ার কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি। কোটালিপাড়া ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার সীমাস্থলে অবস্থিত। সুতরাং এখানকার চলিত ভাষায় দুই জেলারই শব্দ অল্পবিস্তর মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, এই সংগ্রহে যে সকল শব্দ সন্নিবিষ্ট হইল, তাহা কেবল কোটালিপাড়ায় প্রচলিত—স্থানান্তরে সেগুলি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বা অপ্রচলিত। অবশ্য সেরূপ শব্দও যে ইহার মধ্যে নাই, তাহা বলা চলে না। তবে ইহার অনেক শব্দই অন্য অন্য জেলায় একই আকারে—একই অর্থে অথবা একটু ভিন্ন আকারে এবং ভিন্ন অর্থে প্রচলিত আছে। এ কথা ঠিক যে, শব্দগুলি প্রায় সকলই আধুনিক সাহিত্যে অপ্রচলিত। সাহিত্যে অপ্রচলিত অথচ ভিন্ন ভিন্ন জেলায় চলিত শব্দগুলি বিভিন্ন জেলার সংগ্রহে সংগৃহীত হইলে এক একটী শব্দের ব্যাপকতা বুঝা যাইবে। তাই আমি সে শব্দগুলি ত্যাগ করি নাই।

গত ২।৩ বৎসর যাবৎ আমি এই সংগ্রহকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম। যে সকল শব্দ কেবলমাত্র চাষাশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত, সেগুলি এখন পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার বর্ত্তমান সংগ্রহ ভদ্রসম্প্রদায়ের ভাষার উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে Sir

George Grierson এর Behar Peasant Life গ্রন্থে অবলম্বিত শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করা এখানে সম্ভবপর হয় নাই। তবে উহা হইতে আমি যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি, সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতে চাষাশ্রেণীর শব্দ সংগ্রহ করিতে পারিলে তাঁহার গ্রন্থের প্রণালীই অবলম্বন করিব।

এই শব্দ সংগ্রহ করিতে যাইয়া কতকগুলি বিষয়ে আমাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। আমার মনে হয়, সকল শব্দসংগ্রাহককেই এই জাতীয় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ভাষাতত্ত্বালোচীদিগের আলোচনার জন্য তাহাদের কতকগুলির আভাস দিতেছি। বাঙ্গালা বর্ণমালার সাহায্যে প্রত্যেক শব্দের (বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের) প্রকৃত উচ্চারণ নির্দ্দেশ করা একরূপ অসম্ভব। পূর্ব্ববঙ্গের অনন্তরার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া সাধারণতঃ ধাতুর পর 'য়া' যোগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে ফরিদপুরের উচ্চারণ প্রকাশিত হয় না। 'দেখ' ধাতু হইতে অনন্তরার্থে অসমাপিকা ক্রিয়ার উচ্চারণ দ্রুত উচ্চারিত 'দেইখ্‌খা' এইরূপ। ফলতঃ, বর্ণমালার সাহায্যে ইহা প্রকাশিত করা দুরূহ। তাহা ছাড়া, পূর্ব্ববঙ্গে বর্গের চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ একটু নূতন রকমের—সাধারণতঃ তৃতীয় বর্ণের দ্বারা তাহা সূচিত হয়। তাহা ভুল। উহার উচ্চারণ তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের মাঝামাঝি। ফরিদপুরে—শুধু ফরিদপুরে কেন, সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে—চবর্গের উচ্চারণস্থান তালু নহে—দন্তমূল। এই উচ্চারণ নির্দ্দেশ করিবার কোনও নিয়ম বঙ্গীয় বর্ণমালায় করা হয় নাই। হকারের উচ্চারণে উষ্ম বা aspiration অতি অল্প। তবে aspiration একেবারে নাই, ইহাও নহে। সুতরাং অকারের দ্বারা ইহা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। তাহার পর, হ্রস্ব দীর্ঘ, ন ণ, শ ষ স, য জ প্রভৃতির মধ্যে কোন্‌টীকে কোথায় প্রয়োগ করা উচিত, তাহা শব্দের পূর্ব্বরূপ না জানিলে ঠিক করিতে পারা যায় না। সুতরাং এরূপ স্থলে বানান বহু শব্দেই সন্দিগ্ধ থাকিয়া যায়; শব্দের পূর্ব্বরূপ আলোচনা করিয়া এই বানান ঠিক করিতে হইবে। প্রচলিত বাঙ্গালা সাহিত্যেও বানানের এইরূপ গোলমাল যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়—ইহার একটা বিধিব্যবস্থা থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ জাতীয় শব্দসংগ্রহের আর একটী গুরুতর সমস্যা - প্রতিশব্দ ঠিক করা। আমি অনেক স্থলেই কলিকাতা অঞ্চলের ভাষার সাহায্যে শব্দগুলির অর্থ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

অনেক প্রচলিত শব্দ উচ্চারণজন্য অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তনের ফলে একটু নূতন আকার ধারণ করিয়া বিভিন্ন জেলায় ব্যবহৃত হয়, দেখিতে পাওয়া যায়। পরিবর্ত্তন খুব বেশী না হইলে আমি সে সকল শব্দ প্রায়শঃ গ্রহণ করি নাই।

আমার সংগ্রহ সম্পূর্ণ শেষ হইয়াছে বলিতে পারি না —নিত্য নূতন শব্দ চোখে পড়ে। তবে যতগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রকাশিত হইলে ভবিষ্যৎ সংগ্রহের সুবিধা হইবে মনে করিয়াই এগুলি প্রকাশ করিতেছি।

পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার বৈশিষ্ট্য

এই প্রসঙ্গে ফরিদপুর অঞ্চলের ভাষার দুই একটী বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই বিশেষত্বগুলি অনেক স্থলেই শুধু ফরিদপুরেই যে সীমাবদ্ধ, তাহা নহে ; পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানেও উহা দেখিতে পাওয়া যায়।

চবর্গের, বর্গের চতুর্থ বর্ণের, হকারের এবং অনন্তরার্থ অসমাপিকা ক্রিয়ার উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিও উল্লেখযোগ্য।

(১) পশ্চিমবঙ্গে যেরূপ অনেক স্থলে অনুনাসিকের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্ববঙ্গে সেরূপ দেখা যায় না ; পক্ষান্তরে অধিকাংশ স্থলে অনুনাসিকের প্রয়োগ না করায় পূর্ব্ববঙ্গীয়কে পশ্চিমবঙ্গীয়ের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যথা —'পাঁচ পয়সার বাঁশের বাঁশী ফুঁ দিলে বাজে'—পশ্চিমবঙ্গ ; 'পাচ পয়সার বাশের বাশী ফু দিলে বাজে'—পূর্ব্ববঙ্গ।

(২) সমগ্র স্পর্শবর্ণের উচ্চারণেই পূর্ব্ববঙ্গে স্পর্শের শৈথিল্য অনুভূত হয়—পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু স্পর্শ বেশ দৃঢ়।

(৩) পশ্চিমবঙ্গে ভদ্রলোকের মধ্যে ব্যবহৃত বহু শব্দের ন স্থানে পূর্ব্ববঙ্গে ভদ্রলোকের মধ্যে লকারের প্রয়োগ হয়। আবার ইতরশ্রেণীর লোকের মধ্যে নিয়ম ঠিক উলটা। এইরূপ স্থলে পশ্চিমবঙ্গে ল এবং পূর্ব্ববঙ্গে ন ব্যবহৃত হয়। যথা—নেওয়া (পশ্চিম—ভদ্র), লওয়া (পূর্ব্ব—ভদ্র), নন (পূর্ব্ব—ইতর), লিয়েছে (পশ্চিম—ইতর)। নেবু (পশ্চিম)—লেমু (পূর্ব্ব) ; নুচি (পশ্চিম)—লুচি (পূর্ব্ব) ; ন্যাঙটা (পশ্চিম)—ল্যাঙঠা (পূর্ব্ব) ; ন্যাড়া (পশ্চিম)—লাড়া (পূর্ব্ব)।

(৪) কর্ম্মকারক পূর্ব্ববঙ্গে সাধারণতঃ 'রে' প্রত্যয় দ্বারা সূচিত হয়। যথা—আমারে, তোমারে ইত্যাদি।

(৫) সম্বন্ধ পদের বহুবচন 'গো' [হিন্দি—কো, পশ্চিমবঙ্গ—র, দের, দিগের] এই প্রত্যয় দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। যথা—রামগো, শ্যামগো, তোমাগো, আমাগো ইত্যাদি। দুইটী সম্বন্ধ প্রত্যয়ের একত্র প্রয়োগও দেখা যায়। যথা—রামেরগো, শ্যামেরগো, তোমারগো, আমারগো, মোরগো [সংক্ষেপে মোগো] ইত্যাদি।

সর্ব্বনাম শব্দের সম্বন্ধ পদে নিম্ন প্রয়োগগুলি দেখা যায়,—এনার (ইঁহার), তেনার, তান্ (তাঁহার), ওনার ও (ওঁর) ইত্যাদি।

ঘর

খাটাল—মেজে।

হাইতনা—দাওয়া।

পাছদুআর—খিড়্‌কির দরজা।

[দ্রঃ—নাচদুয়ার (পশ্চিমবঙ্গ)=রথ্যাদ্বার]

ওটা—উঠিবার মৃত্তিকানির্ম্মিত পাদপীঠ।

ওটাচালা—ঘরের সম্মুখে চালবিশিষ্ট ছোট বেড়াশূন্য বারান্দা।

পোতা—উচ্চ ভিত্তি।

ডোআ—ভিত্তির পার্শ্ব।

রুআ—

বাগা—

ছোন—খড়।

গৃহের প্রকার-ভেদ—

জুইতের ঘর—

আটচালা—

দোচালা—

তেচালা—

চৌচালা—

লাকারী

মণ্ডপ—চণ্ডীমণ্ডপ।

উগৈর—ঘরের মধ্যে জিনিষ-পত্র রাখিবার মাচা।

কার—ঘরের চালের নীচে বাঁশের তৈযারী জিনিষপত্র রাখার স্থান।

পাটাতন—ঐ তক্তার তৈয়ারী।

আড়—কাপড় প্রভৃতি রাখিবার জন্য গৃহমধ্যে টানান বাঁশ।

আড়া—গৃহের সহিত চাল দৃঢ় সংলগ্ন করিবার জন্য বাঁধা বাঁশ।

ঠ্যাঙ্গা—খিল।

হিস্‌সা, খোলট—তরফ।

গিরটী ঘর—বাসগৃহ।

ছায়লা, ছাবরা—সম্পূর্ণরূপে যে গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই; চালা ঘর।

(ঘরের) আন্ধু—ঝুল।

আসবাবপত্র

ডোল—বড় গভীর ঝাঁকাজাতীয়।

আগৈল—ঝাঁকা।

গোচৈ—ধুচুনি।

চালৈন—চালুনি।

সেইজ [<শয্যা]—বিছানা।

ঘোনা—মশারি।

চকি—তক্তপোষ।

(চকির) খুড়া—পা।

চম্বি—ছোট ঘটী।

কাকৈ—চিরুণী।

কোলা—বড় জালা।

মাঠী—কাল রঙের প্রকাণ্ড জালা।

পিছা—ঝাঁটা।

ত্যানা—ন্যাকড়া।

কোলবালিশ—পাশবালিশ।

ঝারী—গাড়ু।

ছালা—থ'লে, বস্তা।

ধুপতি—ধুনুচি।

তাওয়া—আগুন রাখিবার মাটির পাত্র-বিশেষ।

পোচ—ঘর নিকাইবার ন্যাকরা।

আর্‌সী—আয়না।

বস্থানি—পুটুলি।

কৌটকা—আকৃশি।

খাবরা, খুলী, চরাটী—সরাজাতীয়।

চড়উয়া—ভাত।

ওসার (বি)—ওয়াড়।

ওসার (বিশ)—চওড়া।

ছোরাণী—চাবি।

জোত—কোন কিছু টানাইয়া রাখিবার দড়ি।

খাদা—পাথরের বড় বাটী।

থালী [<স্থালী]—পাত্র।

চুঙা—চোঙ্গা।

ভাণ্ড—বাসন।

গাছা—পিলসুজ।

খোন্তা [<খন্তা*]—সাবল।

পোষাক পরিচ্ছদ

একপাটা—চাদর [দ্রঃ—দোপট্টা বা দোপটা—বিহারী]।

পেরোন—জামা।

জেব—পকেট।

কোছা—কাছা।

গুঠী—কোছা।

আউট—কাপড়ের পাড়।

আঙরাখা বা আঙরাখা—জামা।

পূজার দ্রব্য

তামী—তাম্রকুণ্ড।

খোলা—দেবস্থান [যথা—শীতলাখোলা, নিশাইখোলা]।

রান্নাঘর

ওরসা—রান্নাঘর।

আখা—উনান।

ঝিক—উনানের উচ্চ পার্শ্ব।

পৈথনা—হাঁড়ি রাখিবার মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষ।

পাটা—শিল।

পুতা—নোড়া।

চলা—কাঠ।

পাতিল—হাঁড়ি।

দোআখী—একসঙ্গে দুই উনান।

হাইনশাল [<* হাঁড়িশালা (?)—হাড়্ শিল্—(ময়মনসিংহ)] হেঁশেল।

বাওলি—বেড়ী।

দেরী যাওয়া—এক হাড়ীর ভাতের অর্দ্ধেক সিদ্ধ হওয়া এবং অর্দ্ধেক অসিদ্ধ থাকা।

ছেইমারা—মাছ প্রভৃতি ভাজিয়া রাখা।

খাদ্যদ্রব্য

হুড়ুম—মুড়ি।

পিষ্টক—

চিতৈ—

হাড় ইয়া—

পাটিসাব্ডা—

চুষি—

হলুয়া দলুআ—

খুদের জাউ—খুদের তৈয়ারী ফেনা ভাত।

বেনিয়া ভাত—পোড়ো ভাত।

তিতা ঝোল—শুক্তানি।

লরা—চচ্চড়ি।

উফরা—গুড়মিশ্রিত খৈ।

লোআজিমা—ভাত খাইবার উপকরণ।

পানা—সরবৎ [যথা—বেয়ালপানা, মিছরী-পানা, চিনিপানা]।

পুরা—খিলি [যথা—পানের পুরা]।

ইচা—চিংড়ি মাছ।

ভাজাপোরা—খৈ, মুড়ি প্রভৃতি।

মোউলখা—যে খৈ সম্পূর্ণ ফোটে নাই।

সম্বন্ধবোধক শব্দ

বৌয়াসিনি—ছোট ভ্রাতার স্ত্রী [বহুআসিন—নূতন্ বধূ—বিহারী]।

কোদা—খোকা।

পোলা—ছেলে।

কুদী—খুকী।

নসু—খোকা।

দুদু—খুড়া, কাকা।

ঠাকুরজামাই—ননদপতি।

সৎমা—বিমাতা।

সৎছাওয়াল—সতীনের পুত্র।

ঠাকুরকন্যা—ঠাকুরঝি।

পুতি—কাকা।

খুড়া— " ।

উৎসবাদি

নিতা—নিমন্ত্রণ।

জোকার—উলুধ্বনি।

মুখচন্দ্রিকা—শুভদৃষ্টি।

দধিমঙ্গল—বিবাহাদির দিন প্রাতঃকালে দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করা।

আরোঙ—বাচ।

উঠানী [উত্থানিকা]—আঁতুড় যে দিন শেষ হয়, সেই দিনের কার্য্যাবলী।

নারিকেল ভাঙ্গা—গায়ে হলুদের অনুরূপ।

প্যাচ্‌না—রঙ; বিবাহাদিতে গায়ে দেওয়া হয়।

বৌপুচ্ছা [<বধূপৃচ্ছা ?]—বিবাহের পর প্রথম বধূকে স্বামীর বাড়ীতে অভিনন্দন করিয়া লওয়া।

ঘটবাজী—তুবড়ী।

রয়ানী—মনসার গান।

খেউর—শারদীয়া পূজার সময় প্রতিমার সম্মুখে মুসলমানগণ যে গান করে।

গ্রাম্য দেবদেবী ও ব্রতাদি

মাঘমণ্ডল, যমপুখৈর } —বালিকাদিগের ব্রতবিশেষ।

চুণ্ডীর বত্ত—সূর্য্যপূজাত্মক ব্রতবিশেষ।

চাকৃরী—সূর্য্যোপাসনার প্রকারভেদ।

ক্ষ্যাত্তরের বত্ত—[ক্ষেত্রনাথ শিব]।

বুড়া ঠাকুর—শিব।

নিশাই, নিশানাথ—দেবতাবিশেষ।

আকুলাই, খাড়াকুলাই, অসময় নারায়ণী } —গ্রাম্য স্ত্রী দেবতা-বিশেষ।

হালা—কার্ত্তিক পূজায় ব্যবহৃত এক পাত্রে নানা শস্যের চারা।

ভুল উড়ান—কার্ত্তিকপূজার দিন খড়ের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া বাটীর বাহির করিয়া দেওয়া।

নরদেহ

ঘেটি—মাথা।

গোর—গোঁর।

গুড়মুড়া—গোড়ালি।

কেত্তুলি—বগল।

ঘিলু—মস্তিষ্ক।

ক্যাতর—পিচুটী।

চোপা—(নিন্দাব্যঞ্জক) মুখ।

(চক্ষের) পিছি—চক্ষের লোম।

পোৎমা—চিবুক।

পাসর—কোঁক।

রগ—শিরা।

নীলদারা—মেরুদণ্ড।

ড্যানা—হাত।

দুধ—স্তন, মাই।

আলাজি—আলজিভ।

রোগাদি

ব্যামো—রোগ।

ডাবা—শিশুদের নিউমোনিয়া।

মাসীপিসী—শিশুদের হাম।

লুন্‌তী—হাম।

ছৌদ—চর্ম্মরোগ বিশেষ।

কুনথী কুনী।

চৌখ খরান—চোখ ওঠা।

ধুম জ্বর—খুব বেশী জ্বর।

হেস্‌কি—হেঁচকী।

বিষম—

হাইম—হাঁই।

দন্তরসা—দাঁতের গোড়া ফোলা।

চম্‌টী—খোসা (খোসের)।

বিষ—ব্যথা।

পোরামালঙ্গী—নারাঙ্গা।

গাছপালা, ফলমূল

ফ্যানা—ছড়া [এক ফ্যানা কলা]।

তালবাগুন—বড় বেগুন।

শোলৈ বাগুন—ছোট বেগুন।

কদু—লাউ, [কাঁঠাল—ঢাকা]।

বুট—ছোলা।

জম্বুরা—পাতিনেবু।

বরই [<বদরী]—কুল।

গুয়া [<গুবাক]—শুপারী।

আচি—নারিকেলের মালা।

মরিচ—লঙ্কা।

পম্ফা—পেঁপে।

পানিতালা—তালশাঁস।

পানিকচু—জলজাত ছোট কচু।

দোমুখি—দোপাটি।

গৈয়া—পেয়ারা।

সন্ধ্যাপ্রকাশ—কৃষ্ণকলি ফুল।

কোষ্ঠা—পাট।

ব্যাত্তাগ—বেতগাছের শাঁস।

ব্যাত্তাসি—বেতের খোলা।

বেথৈল—বেতফল।

চালকুমরা—সাঁচি কুমড়া।

আনাজী কলা—কাঁচকলা।

আনাজ—তরকারী।

হ্যালোম্‌চা—হিংচে।

আম্‌সরৎ—আমের পল্লব।

ডাউগ্‌গা—ডগা।

যজ্ঞডুমৈর—যজ্ঞডুমুর।

বড়া বাশ—, তল্লাবাশ— } বাঁশের প্রকারভেদ।

(বাশের) করালি—বাঁশের গোড়া হইতে বহির্গত নূতন বাঁশ।

বাইল্—শুপারী তাল প্রভৃতির খোলা সমেত পাতা।

চোক্‌লা—খোসা।

বৌল—মুকুল।

হালি—গুচ্ছ [এক হালি মূলা]।

ভুচরা—কাঁঠালের পরিত্যক্ত অংশ।

ছেরফল [<শ্রীফল]—বেল।

জামির—নেবুবিশেষ।

করা—কচি ফল [আমের করা, শসার করা]।

ছোবা—ছোবড়া।

বাক্‌তর্‌কারী—ওল।

ক্ষীরৈ—শসাজাতীয় ফলবিশেষ।

চিল্‌থা—কলাপাতার টুক্‌রা।

বৃক্ষের প্রকার-ভেদ—

হিজল—

রয়না—

কাউ—

লতাপাকৈর—

আইষ্ঠালি—

বইন্না—
চৌক্‌খরানি—
বাইর্‌কালি—
ভাইট্—
বোগ—মড়া গাছের গোড়া বা কাণ্ড হইতে যে নূতন গাছ বাহির হয়, তাহা।

জীবজন্তু

ত্যালাচোরা—আর্‌সোলা।
উরাস—ছারপোকা।
ওল্লা—ডেয়ো পিপ্‌ড়ে।
কোতৈর [<কবুতর]—পায়রা।
বল্লা—বোল্‌তা [দ্রঃ—বল্লাশাক]।
জুনী—জোনাকি।
জাতি সাপ—গোখ্‌রো সাপ।
গুইল—গোসাপ।
উড়্‌চুঙা—উচ্চিংড়ী, রুইচিংড়ী।
ম্যারা—ভেড়া।
পক্‌খী—পাখী।
পাখা [<পক্ষ]—ডানা।
কাউয়া—কাক।
পাতিশিয়াল—
ফৈউচ্‌কা—পক্ষিবিশেষ।
উগানি—পোকাবিশেষ।
চ্যালা—বিছা।
বিছা [<বৃশ্চিক]—শোঁয়াপোকা।
ডাউআ ব্যাঙ্—একজাতীয় ব্যাঙ্।
আধার—পাখীর খাদ্য।
দাইর্‌আ—বেজীজাতীয়।
বাজকুরাল—বাজ।
ভুতুম—পক্ষিবিশেষ।
স্তাজা—সজারু।

রমণীসম্প্রদায়ে প্রচলিত শব্দ

গতর—শরীর।
ভাতার—স্বামী।
লগগী [লঘী]—প্রস্রাব *।
ফল দেখা, পুনর্ব্ব দেখা—প্রথম ঋতুমতী হওয়া।
ফল্‌না—অমুক।
রারী—বিধবা।
ঠাকুরকন্যা—ঠাকুরঝি।
হ্যাদে—হ্যাঁরে।
জিভুতপান—ছেলে পিলে।
কুন্নী—কুঁড়ে (স্ত্রীলিঙ্গ)।
(দুধ) আউটান—জ্বাল দেওয়া।
আইরত—এঁড়েয় পাওয়া।

ক্রিয়াবিশেষণাদি

ক্যাম্বায়—কিরূপে।
য্যাম্বায়—যেরূপে।
অ্যাম্বায়—এরূপে।
ত্যাম্বায়—সেরূপে।
আউ—ছি ছি।
আচক্কা, আচক্কা—হঠাৎ [হিন্দী—অচানক]।
হ্যাদে [<হন্দী—প্রাঃ]—হ্যাঁরে।
লগে—সঙ্গে [দ্রঃ—লগে সঙ্গে]।
তমাইত, তমৈ—পর্য্যন্ত [তক—হিন্দী]।
গোরে—নিকটে।
এপিলে—এ রকমে।
সেপিলে—সে রকমে।

---

* পশ্চিমা পণ্ডিতগণ 'লঘ্বী শঙ্কা' (প্রস্রাব) ও 'গুর্ব্বী শঙ্কা' সংস্কৃতে এই দুইটী কথা প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

যেপিলে— যে রকমে।

কোন্ পিলে— কোন্ রকমে।

কৈলে, কৈলাম—কিন্তু [যাব কৈলে, যাব কৈলাম]।

তৈলে—তাহা হইলে।

এ্যানে – 'খন [যাব এ্যানে—যাবখ'ন]।

একছের—এক টানে।

ঝট্ কইর‍্আ—চট্ ক'রে।

মোনে—[যাই মোনে, খাই মোনে]— যাচ্ছি, খাচ্ছি]।

গাট্ঠা (জুয়ান)—খুব বড় পালোয়ান।

স্যাত—তত।

(বেলা) উদানে—উদিত হইলে, বেশী হইলে।

অনুকরণ শব্দ

ছন্ ছন্ করা।

ঢন্ ঢন্ করা—ঘুরিয়া বেড়ান।

উস্‌খুস্ করা।

মাকুথা মাকুথি—গোলমাল, ঝগড়া।

রি রি করা—শির্ শির্ করা।

ম্যান্ ম্যান্ করা—অস্পষ্ট কথা বলা।

আমতা আম্‌তা করা।

ফুইট্যা যাওয়া—ভাঙ্গিয়া যাওয়া [হাড়ি ফোট্‌ছে]।

ক্যালো ব্যালো—কিল্ বিল্।

বিবিধ বিশেষ্য

ডিলা—ঢিল।

ঠসক—দেমাক।

ঠার—ইঙ্গিত।

কছম - রকম।

কাঠঘোরা—হাঁড়িকাঠ।

আথৈট—আবদার [আখুটী—কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণমঙ্গল]।

থাইট্—দাগ।

মাদ্‌বরি—গৌরব।

ঠোস—ফোস্কা।

ছাতকুরা – ছাতা।

ঢক—রকম।

হাউস—সখ।

সোর—চীৎকার [সোরগোল = গোলমাল— পশ্চিমবঙ্গ]।

শান—পাথর।

প্যাচাল, প্যানা—বাজে কথা [দ্রঃ—প্যাচাল পেটা—বাজে কথা বলা]।

সাউগারী—সাধুতা।

রাগ—তীব্রতা [যথা—রৌদ্রের রাগ]।

দক্—তীক্ষ্ণতা [যথা—চূণের দক্]।

লোকুতা—লৌকিকতা[নৌকতা—পশ্চিমবঙ্গ]।

ভরঙ্—ঢঙ্।

রাও—জবাব।

রত্—শক্তি।

দলা—তাল, পিণ্ড [যথা—এক দলা ভাত]।

গৌণ—দেরী।

তাম্মা—হাঙ্গাম, ঝামেলা।

ওক—উঁকি।

খরা—রৌদ্র (বর্ষার বিপরীত)।

কেয়াস—আন্দাজ, অনুমান।

ছিদ্দাত—কষ্ট।

অলবড্ড—আগোছালো।

দেউলা—দেয়ালা।

শারাজিলখী—বিদ্যুৎ।

উছাট—হোঁচট।

চার—সাঁকো।

ফ্যাকনা—আবদার।

খোমেকা—দাবড়ি।

দোমোক—দম।
চাটাম—নিজের গৌরবসূচক অত্যুক্তি।
ডর – ভয়।
শিদ্‌লী—স্যাওলা।
ফাইট—ফুর্‌সুৎ।
দিশা—
পাইল— } – রকম।
কছুম—
ছিরিক্ক—
জোত্তর—জুত।
হাবি জাবি—বাজে জিনিষ।
চারা—খোলা।
পাট্‌খরি—প্যাকাটি।
স্যালা—পানা।
বিরুদ—ঝগড়া।
ভাপ—উত্তাপ।
হাই— ঐ।
টান্‌ঠা—ঝঞ্ঝাট।
ডিলা—ঢিল।
কের্‌দারি—ওস্তাদি।
জায়—তালিকা।
স্বাব্‌খোরাকী—বিনাখোরাকী।
ফর্দ্দি—
ডুমা— } —খণ্ড।
লেইথ—শ্রেণী।
ব্যাস্কম—তফাৎ।
ফারাগ—তফাৎ, দূর।
ভজঘট—গোলমাল।
নাত – শৃঙ্খলা।
রা খরচ – পথখরচ।
পেরি—কাদা।

ব্যাসাতি—পণ্যদ্রব্য।
ব্যাতাসি—বেতের কঞ্চি।
দেওই—মেঘ।
আইরুস—পয়।
টুনি—কঞ্চি।
চটা—বাখারি।
কিরা – শপথ।
হদ—গর্ত্ত।
হাইঙ্গা—লতানে গাছের জন্য মাচা।
ঠ্যাকার—ঢঙ্‌।
আদার—আস্তাকুঁড়।
ছ্যামরা—ছোক্‌ড়া।
পশনকথা—রূপকথা।
তরপথ—তটপথ (দ্রঃ—কৃষ্ণকীর্ত্তন)।
গাঙ্‌ – নদী।
দারা—[<দস্ত<ডাণ্ডা] দণ্ডবৎ নিস্পন্দ।
[যথা—দারা দিছে]।
আউল—বিশৃঙ্খলতা।
(ধোপার) পুইন—ভাটি।
পাট—ধোপা যাহার উপর কাপড় কাচে।
নিশির—শিশির।
ঠাল—ডাল।
কাইজ্‌আ—ঝগ্‌ড়া।
বাস্‌না—স্নেহ, ভালবাসা।
ছোবা—(নারিকেলের) ছোব্‌ড়া।
উজাগার—জাগরণ।
উদ্ধার—ধার।
টরি—কুন্‌কে।
সরিক—অংশীদার।
ব্যানা—মাটির প্রতিমা তৈয়ার করার পূর্ব্বে খড়ের তৈয়ারী মূর্ত্তি।
পেছোন্দার [<Passenger]—আরোহী।